চরিত্র গঠনে
নামাযের অবদান
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
(সূরা আনকাবূত -৪৫)

চরিত্র গঠনে নামাযের অবদান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

চরিত্র গঠনে নামাযের অবদান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৪

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ সাইদুর রহমান
শিল্পকোণ, ৪২৩ বড়মগবাজার, ওয়্যারলেস রেলগেট, ঢাকা- ১২১৭

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ৮০ টাকা মাত্র

Charittra Gatone Namazer Obdan
Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global publishing Network, Dhaka.
First Edition : December 2004
Price : Eighty Tk only
Three Doller (U.S) Only
Two Pound Only

যা বলতে চেয়েছি

সকল নবী ও রাসূলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই ছিলো এবং মহান আল্লাহর গোলামী করার লক্ষ্যে তাঁরা যখন মানুষকে আহ্বান করেছেন, তখন প্রথমেই নামায আদায়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ এই নামাযই মানুষকে আল্লাহর গোলামীতে অভ্যস্থ করে তোলে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায একজন মানুষকে এ কথা পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর গোলাম এবং তাকে মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। শুধু মাত্র নামাযের সময়ই মানুষ আল্লাহর গোলাম নয়– নামাযের বাইরের জীবনেও সে আল্লাহর গোলাম, এ কথাটিই নামায মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালার একনিষ্ঠ গোলাম হওয়ার জন্য এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করার জন্য যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অপরিহার্য, নামায সেসব অপরিহার্য গুণ-বৈশিষ্ট্য কিভাবে মানুষের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়, তা-ই এই ক্ষুদ্র পরিসরে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নামায আদায় করার জন্য যখন একজন মানুষ দন্ডায়মান হয়, তখন তার মনে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, সে গোটা সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাশক্তিধর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সে সিজ্দা নিবেদন করছে। যা কিছুই সে মুখে আবৃত্তি করছে, তা সবই মহান মালিকের উদ্দেশ্যে। নামাযে সে উঠা-বসা, রুকু-সিজ্দা দেয়া ইত্যাদি যা করছে, তার সবটাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ নামাযের মধ্যে সে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহকেই স্মরণে রাখছে। এভাবে নামায মানুষকে এ কথাই জানিয়ে দিলো যে, সে নামাযের মধ্যে যেমন আল্লাহকে স্মরণ করেছে, অনুরূপভাবে নামাযের বাইরের জীবনে প্রত্যেক মুহূর্তে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর কথা স্মরণ রাখবে। ঈমান আনার অর্থ শুধু মৌখিকভাবে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় যে, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলবো। বরং ঈমান আনার অর্থ হলো, মৌখিকভাবে স্বীকৃতির দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে মহান আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ করা বা বাস্তব আনুগত্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা একান্তই অপরিহার্য। পক্ষান্তরে বাস্তব আনুগত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন হলো নামায। কোনো ব্যক্তি যদি সকাল দশটার সময় ঈমান আনে আর মাত্র দুই তিন ঘন্টা পরে যখন তার কানে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি প্রবেশ করে, তখনই তার ঈমান আনার দাবির স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণ পেশ করার সময় এসে উপস্থিত হয়। মুয়াজ্জিনের আহ্বান শোনার

সাথে সাথে যদি ঈমানের দাবিদার উক্ত ব্যক্তি নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে জামাআতে শামিল হয়, তাহলে সে তার ঈমানের দাবির স্বপক্ষে বাস্তবে এ কথার প্রমাণ পেশ করলো যে, উক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে মহান আল্লাহর দাসত্বের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালিত করবে।

আর যদি সে নামায আদায় না করে, তাহলে এ কথারই প্রমাণ দিলো যে, মুখে যে ঈমানের দাবি সে করেছে– তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পৃথিবীতে সে আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব করতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। আর আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ত্যাগ করে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবি করার কোনো ইখতিয়ার রাখে না। বেনামাযী কোনো ব্যক্তি মুসলিম সমাজ-সংগঠনের কোনো সুযোগ-সুবিধাও লাভ করতে পারে না।

আল্লাহু আকবর– শব্দ দুটো মুখে উচ্চারণ করে নামাযে দাঁড়ানোর অর্থই হলো, আল্লাহ তা'য়ালা এবং মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত এই পৃথিবীতে যত মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান যেখানে যা কিছু রয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ ও মা'বুদের দাবীদার যে যেখানে আছে, সবই আমার পায়ের নীচে। যারা নামায আদায় করেন, তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সূচনাতে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে ওয়াদা করছেন। কিন্তু এই ওয়াদা কতটুকু পালন করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে নামায আদায়কারীগণ কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সাক্ষী রেখে যে কথাগুলো একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেই কথাগুলো বাস্তব জীবনে কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে, এই হিসাব কি কখনো করা হচ্ছে?

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ গঠন করেছিলেন, আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'য়ালা সেই নামাযের শিক্ষা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গঠন করার তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

শহীদবাগ– ঢাকা

আলোচিত বিষয়

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল আসর, সূরা লুকমান, আমপারা

আল্লামা সাঈদী সাহেবের রচিত গবেষণাধর্মী কয়েকটি বই

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

শিশু কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

চরিত্র গঠনে নামাযের অবদান

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?

মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

নামাযের আলোচনা আমরা পবিত্র কোরআনের সূরা লুকমানের সেই আয়াত দিয়ে শুরু করছি, যে আয়াতে বলা হয়েছে–

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ-هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ-اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য। যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং শেষ বিচার দিনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। এরাই তাদের রব-এর পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই হবে সফলকাম। (সূরা লুকমান-২-৫)

জ্ঞানগর্ভ কিতাব– অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল কোরআন হলো মুহ্সিনীন বা সৎলোকদের জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত। মুহ্সিনীনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উল্লেখিত আয়াতে বলেন, 'যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং শেষ বিচার দিনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।' অর্থাৎ মুহসিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের প্রধান তিনটি গুণই হলো, তারা নামায আদায় করে, সম্পদশালী হলে যাকাত আদায় করে এবং মৃত্যুর পরের জীবন তথা বিচার দিবসের প্রতি দৃঢ় ও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। এই তিনটি গুণই যে মুহ্সিনীন বা সৎকর্মশীলদের লোকদের একমাত্র গুণ– এ কথা কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়নি।

আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, এই কিতাব মুহসিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। এ কথা বলে মুহ্সিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের পরিচয় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তারা জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজে একমাত্র এই কিতাব থেকেই পথনির্দেশনা গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই কিতাবের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে। এই কিতাবের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে তিনটি গুণ একান্ত প্রয়োজন, সেই তিনটি গুণের কথাই আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নামায আদায় করে, যাকাত দান করে এবং আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

কারণ মুহ্‌সিনীন বা সৎকর্মশীল হতে হলে মানব চরিত্রে এই তিনটি গুণের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, এই তিনটি গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়, অপরাপর সৎ গুণাবলীর সমাহার তার চরিত্রে এমনিতেই ঘটে। এই তিনটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হলে, কোরআন-হাদীসে বর্ণিত অপরাপর সৎ গুণ ক্রমশ ব্যক্তির চরিত্রে প্রকাশ পেতে থাকে।

অর্থাৎ নামায, যাকাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস– এই তিনটি গুণ অন্য সকল সৎ গুণের আমদানি কারক বা স্রষ্টা। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় যারা নামায আদায় করে, তাদের মধ্যে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশ পালন করার এক স্থায়ী অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং তাদের হৃদয়ে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহর ভয় জাগরূক থাকে। ফলে সেই ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই সহজ বিষয়ে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় যারা যাকাত আদায় করে, তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রবণতা ক্রমশ দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে থাকে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি তাদের হৃদয় থেকে লোভ-লালসা বিদূরিত হতে থাকে এবং মন-মানসিকতা ক্রমশ আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের পথের দিকে ধাবিত হতে থাকে। কৃপণতার মতো খারাপ গুণ চরিত্র থেকে বিদায় নেয়।

ফলে এসব লোক পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যায়-অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ার নেশায় মেতে ওঠে না। আর এ কথা বস্তুসিদ্ধ যে, অন্যায় অবৈধ পথে ধন-সম্পদ অর্জন করতে যাওয়ার অর্থই হলো নানা ধরনের দুষ্কৃতির মধ্যে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা এবং সমাজ কাঠামোয় দুর্নীতি নামক ঘুন সৃষ্টি করা।

তৃতীয় যে গুণের কথাটি বলা হয়েছে, তাহলো তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন নয়– মৃত্যুর পরেও আরেকটি অনন্ত জীবন রয়েছে এবং সেই জীবনে এই পৃথিবীতে করে যাওয়া যাবতীয় কর্মের হিসাব মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদালতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পেশ করতে হবে। হিসাবের পরে সৎ ও অসৎ কর্মানুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

এই বিশ্বাস যাদের মধ্যে সক্রিয় থাকে, তাদের মধ্যে অসংখ্য সৎ গুণাবলীর সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এই গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের মধ্যে

দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে তারা স্বেচ্ছাচারী হয় না, মন যা চায়– তাই তারা করতে পারে না। এদের জীবন হয় পরিমার্জিত, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত এবং প্রত্যেকটি কথা ও কাজের মধ্যে সততা-ন্যায় পরায়ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে বক্ষমান গ্রন্থে আমরা প্রথম গুণটি সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহ্সিনীন তথা সৎ লোকদের প্রধান যে তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, এই তিনটি গুণ এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে– উল্লেখিত তিনটি গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে, স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যক্তির চরিত্রে অন্যান্য সকল ভালো গুণসমূহ ক্রমশ বিকশিত হতে থাকবে। তিনটি গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের কথা বলা হয়েছে। কারণ একমাত্র এই নামাযই মানুষকে ক্রমশ আল্লাহ তা'য়ালার একনিষ্ঠ গোলামে পরিণত করে এবং ব্যক্তির চরিত্রে অসংখ্য সৎ গুণসমূহ বিকশিত করে। মানুষের চরিত্র থেকে যাবতীয় খারাপ গুণ বিদূরিত করে এবং গর্হিত কাজ ও মানুষের মধ্যে ক্রমশ যোজন যোজন ব্যবধান সৃষ্টি করে।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, নামায জিনিসটা কি এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ও রাসূলের হাদীসে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে নামায আদায়ের ব্যাপারে কেনো এত তাগিদ করা হয়েছে? এ জন্য নামায সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত আবশ্যক। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) (اَنَّ سَمِعَ) رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-يَقُوْلُ اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذَالِكَ يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ؟ قَالُوْا لَايُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئًا-قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا-

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–তোমরা ভেবে দেখো, তোমাদের কারোর দরজার সামনে দিয়ে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে কি? সাহাবায়ে

কেরাম জবাব দিলেন, না– তার শরীরে কেনো ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসূল বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা গোনাহ্‌সমূহ মুছে ফেলে দেন। (বোখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির বাড়ির সামনে যদি নদী থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি উক্ত নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে সেই ব্যক্তির শরীরে কোনো ময়লা জমার অবকাশ থাকে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থানুসারে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যক্তি পাপের ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়– আর পাপের ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অর্থই হলো সেই ব্যক্তি যাবতীয় গর্হিত কর্মকান্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখে। একজন মানুষ যখন নিজেকে অসৎ গুণাবলী থেকে নিজেকে দূরে রাখে, তখন তার মধ্যে অনিবার্যরূপে সৎ গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে।

এই বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একান্তভাবেই একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, সে কোন্ নামায– যে নামায আদায় করলে পাপের ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায় এবং স্বভাব-চরিত্রে অনিবার্যরূপে সৎ গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে? সেই নামায সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন 'ইবাদাত' শব্দটির মর্মার্থ অনুধাবন করা। যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টিই করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে। এ জন্য 'ইবাদাত' বলতে কি বুঝায়, কোন্ বস্তুর নাম 'ইবাদাত', আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার কাছ থেকে কোন্ 'ইবাদাত' চান এবং মানুষকে কোন্ 'ইবাদাত' শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে তিনি অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন– এ বিষয়টি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে।

এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইবাদাতের সঠিক ও তাত্ত্বিক অর্থ বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠী ভুলে গিয়েছে। মুসলমানরা নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরআন তিলাওয়াতসহ অন্যান্য সামান্য কিছু কাজের নাম দিয়েছে ইবাদাত এবং এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, এসব কাজ করার অর্থই হলো ইবাদাত করা এবং এসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা যে, ইবাদাতের হক আদায় হয়ে গিয়েছে। এই বিরাট ভুলের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের সাধারণ মানুষ যেমন নিপতিত হয়েছে, অনুরূপভাবে নিমজ্জিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের অধিকাংশ চিন্তানায়কগণ। জীবনের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশ 'ইবাদাত' নামক এই কাজের জন্য বরাদ্দ করে

জীবনের অবশিষ্ট বিরাট অংশ তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত থেকে নিজেদেরকে স্বাধীন বানিয়ে নিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো, তারা 'ইবাদাত' শব্দের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং কোরআনেও এ কথাটি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং এই ইবাদাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। কারণ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বান্দার যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তার মানব জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

একজন ছাত্র যদি লেখাপড়ায় কৃতকার্য হতে না পারে, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে– ছাত্র তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বুণন শিল্পী যদি যথাযথভাবে বুণন কাজে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে সে এ কথাই প্রমাণ করবে যে– বুণন শিল্পী হিসাবে সে ব্যর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে একজন মানুষ যদি তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানে, তাহলে এ কথাই প্রমাণ হবে যে, মানুষ হিসাবে তার গোটা জীবনই সে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। মানুষ হিসাবে এই বিষয়টি সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে চেতনার জগতে জগরুক রাখতে হবে যে, একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা।

আরবী ভাষার عبد 'আব্দ' শব্দ থেকে 'ইবাদাত' শব্দটি এসেছে এবং 'আবদ' শব্দের অর্থ হলো চাকর, ভৃত্য, দাস বা গোলাম। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলা হয় Servant। সুতরাং ইবাদাত শব্দের অর্থ হলো, গোলামী করা বা দাসত্ব করা। ইংরেজী ভাষায় দাসত্ব বলতে Slavery বুঝায় এবং ইবাদাত শব্দের অর্থ এভাবে করা যেতে পারে Work or serve as a slave। কোনো দাস বা ভৃত্য যদি যথার্থভাবেই তার মনিবের আজ্ঞানুবর্তী হয় বা মনিবের আদেশানুসারে যাবতীয় কাজের আঞ্জাম দেয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, লোকটি তার মনিবের দাসত্ব করছে। আর ইসলামী পরিভাষায় একেই বলা হবে লোকটি তার মনিবের ইবাদাত করছে।

আর মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও যে চাকর যথারীতি তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে না, মনিবের আদেশের বিপরীত কাজ করে তাহলে এ

ধরনের চাকরকে বলা হবে অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ চাকরটি সুস্পষ্টভাবে মনিবের নাফরমানীমূলক কাজ করে যাচ্ছে। চাকরের কাজ হয় সাধারণত তিনটি। চাকরের প্রথম কাজ হলো, সে যার চাকর প্রথমে তাকে মনিব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কারণ মনিব তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করছেন। এ কারণে চাকর একমাত্র মনিবের আদেশ ব্যতীত অন্য কারো আদেশ মানবে না এবং মনিবের আনুগত্য ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করবে না। মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কারণে চাকর মনিবের দেয়া দায়িত্বের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করবে না এবং মনিবের অপছন্দনীয় কোনো কাজে সে নিজেকে জড়িত করবে না।

মনিব চাকরের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করছেন, এ জন্য চাকরের এটা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সে মনিবের প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করবে। মনিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করবে, মনিবের সম্মান-মর্যাদার বিপরীত কোনো কাজ করবে না বা এ ধরনের কোনো চিন্তাও মনে স্থান দেবে না। এই তিনটি কাজ যথাযথভাবে যে চাকর আঞ্জাম দেয়, তাকেই সঠিক অর্থে চাকর বলা যেতে পারে। এভাবে যে চাকর কাজ করে, সেই চাকর সম্পর্কেই বলা যায় যে, চাকরটি মনিবের ইবাদাত করছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে যথাযথভাবে টিকে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি অনুগ্রহ করে করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা হলেন মনিব আর মানুষ হলো তাঁর গোলাম বা চাকর। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাঁরা এই কথাটিই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- তোমাদের মনিব হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তোমাদের দায়িত্ব হলো, তোমরা কেবলমাত্র সেই আল্লাহরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে- অন্য কারো নয়। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যে পৃথিবীতে তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন- সেই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য তিনিই বাসোপযোগী করেছেন, এখানে সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা একমাত্র তিনিই পূরণ করেছেন। আর এই কাজে তাঁর সাথে অন্য কেউ শরীক নেই।

সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁকেই মনিব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই আনুগত্য করবে, তাঁরই আইন অনুসরণ করবে, তাঁরই দেয়া জীবন বিধান অনুসারে পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালনা করবে এবং তাঁর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজে নিজেদেরকে জড়িত করবে না। সংক্ষেপে এটাই হলো ইবাদাত শব্দের মূল অর্থ।

চাকর মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে মনিবের আদেশানুসারে যদি নিজেকে পরিচালিত করে, তাহলে বলা যেতে পারে যে- চাকরটি মনিবের ইবাদাত করছে। আর চাকর যদি মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে মনিবের আদেশ অনুসরণ না করে, তাহলে বলা যেতে পারে যে- চাকরটি মনিবের নাফরমানী করছে বা মনিবের আদেশ অমান্য করছে। চাকর যদি মনিবের দেয়া বাসস্থানে অবস্থান করছে, মনিবের দেয়া যাবতীয় উপকরণে জীবন ধারণ করছে।

মনিব সেই চাকরকে তার চব্বিশ ঘন্টার কর্মসূচী দিয়ে দিলো। কখন সে কোন্ কোন্ কাজ আঞ্জাম দেবে, কখন সে আহার করবে, কখন বিশ্রাম করবে, নিদ্রা যাবে, মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য চিত্ত বিনোদন করবে- অর্থাৎ একজন মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন ধারণের উপযোগী কর্মসূচী মনিব প্রদান করলেন। কর্মসূচী অনুসারে চাকর মনিবের দেয়া আদেশসমূহ পালন করতে থাকবে- এটাই হলো চাকরের দায়িত্ব।

কর্মসূচী অনুসারে মনিবের সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আসা ও নিয়ে আসার সময় হলো। বাগানের গাছগুলোয় পানি সিঞ্চনের সময় হলো। বাগানের আগাছাসমূহ পরিষ্কার করার সময় হলো। পশুদল এসে সাজানো বাগান তছনছ করতে থাকলো, চাকর পশুদলকে তাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলো না। সে কোনো দায়িত্ব পালন না করে মনিবের দেয়া ঘরে অবস্থান করে মনিব যে লিখিত কর্মসূচী দিয়েছেন, তা মধুর স্বরে বার বার আবৃত্তি করতে থাকলো আর মনিবের প্রশংসা করতে থাকলো।

এই ধরনের চাকর সম্পর্কে তো এ কথাই বলা হবে যে, চাকরটি মনিবের ইবাদাত করছে না- বরং সে মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে প্রত্যেক পদে মনিবের আদেশ অমান্য করছে। মনিবের বাগানের সবুজ-শ্যামল সজিব গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রখর রৌদ্রতাপে গাছগুলো সজিবতা হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়ছে, পশুদল বাগানে প্রবেশ করে সাজানো বাগান তছনছ করে দিচ্ছে। আর চাকর সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মনিবের দেয়া কর্মসূচী মধুর স্বরে পড়ছে এবং মনিবের প্রশংসা করছে। সুতরাং এই চাকর মনিবের ইবাদাত না করে মনিবের নাফরমানী করে যাচ্ছে। এই ধরনের চাকর সম্পর্কে লোকজন মনিব লোকটিকে তো এই পরামর্শই দেবে, 'ঐ অকৃতজ্ঞ চাকরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে একজন আনুগত্য পরায়ণ চাকর বহাল করুন।'

মানুষের ক্ষেত্রে যদি এই কথা প্রযোজ্য হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ঐসব চাকর সম্পর্কে কি বলা যাবে? যে চাকরকে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার জন্য

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন নামক কর্মসূচী দিয়েছেন, কিন্তু সেই চাকর কোরআনের কোনো আদেশ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র কোরআন তিলাওয়াত করছে, আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে একের পর এক সিজ্দা দিয়েই যাচ্ছে, বার বার আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবী নামক বাগানকে সুন্দর সজিব রাখার লক্ষ্যে তাঁর চাকরকে কোরআনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার আদেশ দিলেন, কিন্তু চাকর সে আদেশ পালন না করে কর্মসূচী তিলাওয়াত করতে থাকলো।

ফলে পৃথিবী নামক এই বাগানে শয়তান নানা ধরনের আগাছা সৃষ্টি করতে লাগলো, গোটা বাগানকে তছনছ করার লক্ষ্যে তৎপরতা চালাতে থাকলো। গোটা পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে পৃথিবীময় অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিলো। আল্লাহর সেই চাকর এসব দিক থেকে চোখ বন্ধ করে রেখে– অশান্তি, অনাচার, অত্যাচার-জুলুম, নির্যাতন-নিষ্পেষন বিদূরিত করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যে কর্মসূচী দিয়েছেন, তা তিলাওয়াত করতে থাকলো।

এই ধরনের চাকর সম্পর্কে কি এ কথা বলা যাবে যে, সে আল্লাহর ইবাদাত করছে? অবশ্যই সে আল্লাহর ইবাদাত করছে না– বরং সে প্রত্যেক পদে আল্লাহর নাফরমানী করে যাচ্ছে। অথচ দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, ইবাদাত শব্দের সঠিক অর্থ জানা না থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর ঐসব নাফরমান চাকরদের সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধার সাথে মন্তব্য করে থাকে, 'লোকটি আল্লাহর ইবাদাত গুজার বান্দাহ্– লোকটি অত্যন্ত পরহেজগার মানুষ।' একটি অফিসে একজন লোক চাকরী করে। সে যার চাকরী করে সেই মনিব তার চাকরকে ডিউটি চলাকালে পরিধানের জন্য বিশেষ পোষাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মনিব যখন অফিসে আসবেন, চাকর মনিবকে সালাম জানাবে– এ আদেশও তিনি দিয়েছেন। সেই সাথে অফিসের যাবতীয় আসবাব পত্র রক্ষাণাবেক্ষণসহ অফিসের নিরাপত্তার দায়িত্বও তার প্রতি অর্পণ করেছেন। কোনো দুর্বৃত্তের দল অফিসে প্রকাশ্যে বা চুপিসারে প্রবেশ করে অফিসের যেন ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সেটা প্রতিরোধ করার জন্য মনিব সেই চাকরকে অস্ত্রও প্রদান করেছেন। চাকরের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে অফিসকে কর্মচঞ্চল ও অফিসে সার্বিক শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করে চাকরের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

এখন এই চাকর যদি শুধুমাত্র বিশেষ পোষাক পরিধান করে অফিসে হাজিরা দেয় এবং মনিবকে সালাম জানায়, অথচ তার ওপরে অর্পিত কোনো দায়িত্ব সে পালন না

করে– দুর্বৃত্তদল কর্তৃক অফিস আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু চাকর মনিবের দেয়া অস্ত্র ব্যবহার না করে দুর্বৃত্তদলকে নির্বিঘ্নে অফিস লুট করার কাজে সহযোগিতা করে। তাহলে এই চাকরকে কি মনিবের অনুগত চাকর বলা যাবে? সাধারণ জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই ধরনের চাকরকে নানা ধরনের খারাপ বিশেষণে বিশেষিত করবে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহর কোনো চাকর যখন এই ধরনের আচরণ স্বয়ং আল্লাহর সাথে করছে– আমাদের সমাজের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী-পন্ডিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা সর্বশ্রেণীর লোকদের কাছে আল্লাহর সেই চাকর অত্যন্ত পরহেজগার, ইবাদাত গুজার, আল্লাহভীরু, ধর্মভীরু, সৎলোক ও ন্যায়-পরায়ণ ইত্যাদি উত্তম বিশেষণে বিশেষিত হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো, ইবাদাত বলতে কি বুঝায়– তা আমরা অনুধাবন করিনি এবং সঠিক ইবাদাতের সাথে আমাদের পরিচয় নেই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবী নামক এই অফিসে শান্তি, শৃংখলা, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মুসলমানদের প্রতি। এই পৃথিবীতে খোদ শয়তান এবং মানুষের মধ্যে যারা তার মুরীদ রয়েছে, তারা যেনো তাদের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ, আদর্শ, নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রকাশ্যে বা চুপিসারে চালু করে পৃথিবীর শান্তিময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে না তোলে, সেদিকে মুসলমানদের সজাগ দৃষ্টি রাখার আদেশ দিয়েছেন। তাকে কোরআন নামক সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার দিয়ে সজ্জিত করেছেন– যে হাতিয়ার দিয়ে মুসলমানরা শয়তানের যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করবে।

অথচ মুসলমানরা সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। বরং এদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআন নামক সেই হাতিয়ারকে রুটি-রুজি অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছে, কেউ কোরআনকে তাবিজের কিতাবে পরিণত করেছে। কেউ মাথায় টুপি-পাগড়ী ও গায়ে জুব্বা পরিধান করে ঐ দুর্বৃত্তদলকে সহযোগিতা করছে, যারা মন-মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারা, মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি সমাজ ও দেশে চালু করে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর দ্বীনের দুশমনদের সহায়তাকারী একশ্রেণীর টুপি, পাগড়ী, জুব্বা পরিধানকারী আলিম, পীর-মাশায়েখ উপাধিধারী লোকগুলো দ্বীনদার, ঈমানদার, পরহেজগার ইবাদাত গুজার নামে লোকদের কাছে আখ্যায়িত হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো, ইবাদাত সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, টুপি-পাগড়ী, জুব্বা পরিধান করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, রমজান মাসের রোজা পালন করা এবং সামর্থ থাকলে যাকাত

আদায় করা ও মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করে আসার নামই শুধু ইবাদাত নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যে পূরণ হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা যে ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ইবাদাত হলো- মানুষ তার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল দিক, বিভাগ ও স্তরে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তেই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে জীবন পরিচালিত করবে এবং কোরআন-হাদীসের বিপরীত যা কিছুর অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে রয়েছে, তা অনুসরণ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করবে। মানুষের মনিব আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর গোলামদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই সীমার মধ্যেই গোলামদের যাবতীয় তৎপরতা ও গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকবে। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থান করে জীবন পরিচালিত করবে, তার জীবনের সবটুকুই ইবাদাত হিসাবে গণ্য হবে।

কোরআন-সুন্নাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে রাজনীতি করা, দেশ পরিচালনা করা, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আচরণ করা, কারো সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করা, নিজের পারিবারিক জীবন পরিচালনা করা, সমরাঙ্গণে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করা, দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির প্রতি মহব্বত পোষণ করা, আহারাদি করা, বিশ্রাম গ্রহণ করা বা নিদ্রা যাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করা, কোনো বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা, কোনো কারণে দুঃখ প্রকাশ করা বা রোদন করা, কারো সাথে লেন-দেন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাকরী করা, কাউকে শিক্ষা দেয়া, ক্ষেতে হাল-চাষ করা, এক কথায় রান্না ঘর আর বাথরুমের কাজ থেকে শুরু করে দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ পরিচালনা করার যাবতীয় কাজই ইবাদাতের মধ্যে গণ্য।

অর্থাৎ যেসব কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এই ধারণা অর্জন করেছে যে, এসব কাজ হলো, 'দুনিয়াদারীর কাজ' এসব কাজই ইবাদাতের মধ্যে শামিল হবে, যদি তা কোরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে সম্পাদন করা হয়। আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করবে একমাত্র তাঁরই দেয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে।

মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আগমন করার পরে যখন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে, তখন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার নামই হলো ইবাদাত। শুধুমাত্র

নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাতের নামই ইবাদাত নয়। এই ইবাদাত করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করা হয়নি, কোনো সময়ও নির্ধারণ করা হয়নি এবং এই ইবাদাতের কোনো বাহ্যিক রূপ নেই। পানির অতল তলদেশে, পাতাল গহ্বরে প্রবেশ করে অথবা মহাকাশের শূন্যে গর্ভে অবস্থান করেও এই ইবাদাত করা যায়। অর্থাৎ মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেনো, সর্বত্রই তাকে স্মরণে রাখতে হবে যে- মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার মনিব আর সে হলো ঐ মনিবের গোলাম। আল্লাহর গোলামী থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে মুক্ত-স্বাধীন ভাবতে পারে না। যখন সে নামায আদায় করছে, তখন যেমন সে আল্লাহর গোলাম, আর যখন সে দেশের সর্বময় ক্ষমতার আসনে আসন গ্রহণ করেছে, তখনও সে মহান আল্লাহর গোলাম।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরআন তিলাওয়াতই যদি শুধুমাত্র ইবাদাত না হয়, তাহলে এগুলো কোন্ নামে আখ্যায়িত করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, অবশ্যই এগুলো ইবাদাত এবং এসব ইবাদাত মুসলমানদের প্রতি বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে এ জন্য যে- যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষকে পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা।

নামায এমন একটি ইবাদাত- যে ইবাদাত একজন মুসলমানকে প্রত্যেক দিন পাঁচ বার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে মহান আল্লাহর গোলাম এবং একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করাই তাঁর দায়িত্ব।

রোজা এমন একটি ইবাদাত যে, বছরের একটি পূর্ণ মাস সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে একজন মনে এ কথা জাগরুক রাখে- সে মহান আল্লাহর গোলাম। রমজান মাসে দিনের বেলায় হালাল কাজসমূহ থেকে রোজা একজন মুসলমানকে বিরত রেখে এ কথাই জানিয়ে দেয়, 'আল্লাহর আদেশে যেমন তুমি হালাল কাজ থেকে বিরত রয়েছো, তেমনি বছরের অবশিষ্ট মাসগুলোয় মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।' এভাবে রোজা একজন মুসলমানকে সেই ইবাদাতের দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়, যে ইবাদাত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

যাকাত নামক ইবাদাত একজন মুসলমানকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে যা উপার্জন করছে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দান করছেন। সুতরাং এই দান সে তার নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারে না। তার উপার্জনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্যের যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন, সেই অধিকার তাকে

আদায় করতে হবে। এভাবে যাকাতও তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে স্বেচ্ছাচারী নয়– সে মহান আল্লাহর আদেশের অনুগত গোলাম। হজ্জ এমন একটি ইবাদাত যে, এই হজ্জ নামক মহাসম্মেলন একজন মুসলমানের মনে তার মনিব আল্লাহ তা'য়ালার প্রেম-ভালোবাসার প্রবাহিত ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে দেয়। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান, সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা– এ কথা হজ্জ একজন মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়।

কোরআন তিলাওয়াত নামক ইবাদাত তিলাওয়াতকারীর মনে এ কথাই সৃষ্টি করে দেয় যে, সে তার মালিকের পাঠানো বাণী তিলাওয়াত করছে, মালিক তার জীবন পরিচালনার জন্য যে পথনির্দেশনা অনুগ্রহ করে দিয়েছেন, সে তাই তিলাওয়াত করছে– তথা মালিকের সাথে কথা বলছে। এভাবে এসব ইবাদাত মানুষকে সেই লক্ষ্য পানে এগিয়ে দেয়, যে লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

নামায কি ও কেন

সকল নবী ও রাসূলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই ছিলো এবং মহান আল্লাহর গোলামী করার লক্ষ্যে তাঁরা যখন মানুষকে আহ্বান করেছেন, তখন প্রথমেই নামায আদায়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ এই নামাযই মানুষকে আল্লাহর গোলামীতে অভ্যস্থ করে তোলে। পবিত্র কোরআনে নামায বুঝানোর জন্য صلوة 'সালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে সালাত অর্থ কোনো জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা, অগ্রসর হওয়া ও নিকটবর্তী হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় সালাত শব্দ দিয়ে আল্লাহর দিকে লক্ষ্য আরোপ করা, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া ও তাঁর একান্ত নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়। নামায তাওহীদের অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ এবং ঈমানের স্থায়ী নিদর্শন। আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাওহীদ যদি পূর্ণ দ্বীনের মূল উৎস হয়, তাহলে আমলের দিক দিয়ে নামায পূর্ণ দ্বীনের আমলী মূলভিত্তি। এর বাস্তবায়ন পূর্ণ দ্বীনেরই বাস্তবায়ন ধরা যায়। তা মু'মিনের কেবল একটি উত্তম আমলই নয় বরং সমস্ত নেক আমলের ভিত্তিমূল।

এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কোরআনে নামায আদায় করার ভাষা প্রয়োগ না করে নামাযের হেফাযত করা ও কায়েম করার ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে নামায অবহেলিতভাবে আদায় করাই ফরজ নয়, বরং পূর্ণ গুরুত্বের

সাথে, একাগ্রচিত্তে এর আদব রক্ষা করে যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا-فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ-مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমস্ত লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর তৈরী কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাঁকে ভয় করো নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের দলে শামিল হয়ো না। (সূরা আর রুম-৩০-৩১)

মানুষকে আসলেই আল্লাহর বান্দা বা দাস হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একমুখী হয়ে তার স্রষ্টার বন্দেগীর ওপর দৃঢ় থাকাই তার স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার মন-মস্তিষ্ক ও আচার আচরণ একনিষ্ঠভাবে একাধারে দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার ওপর নামায ফরয করেছেন। বান্দার এ নামায কায়েম করা মানে সেই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার প্রতিষ্ঠার বাস্তব অনুশীলন। বান্দা দিনে বার বার হাত বেঁধে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তাঁর বন্দেগীর স্বীকৃতি দেয়, তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে সিজদায় গিয়ে ঘোষণা করে যে, আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একাগ্রচিত্তে একমাত্র এক আল্লাহর দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতিকে সমস্ত কিছুর দাসত্ব পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর গোলামী করার জন্য তাদেরকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা বিদ্রুপ করে বলেছিলো–

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا-اِنَّكَ لاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ-

তারা জবাব দিল, হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথা শেখায় যে, আমরা এমনসব মাবুদকে পরিত্যাগ করব, যাদেরকে আমাদের পূর্ব পুরুষরা পূজা

করত? অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার থাকবে না? নিশ্চয় তুমিই রয়ে গেছে একমাত্র উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী ও সদাচারী। (সূরা হুদ-৮৭)

হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম নিজের জাতির বাতিল মা'বুদদের সমালোচনা করে জাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান জানান এবং বলেন যে, এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি হচ্ছে, তোমরা জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলবে; তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন ইত্যাদিকে পূর্ণ সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধানের বিপরীত আচরণ করা যাবে না।

আল্লাহর নবীর মুখে দ্বীনের এই ব্যাপক দাওয়াত শুনে তার জাতির লোকেরা বললো, হে শু'আইব! তুমি আমাদের এ কোন ধরনের দাসত্বের দিকে আহ্বান করছো এবং কেমন নামায আদায়ের কথা বলছো? আচ্ছা, আল্লাহকে রাজি করতে কি আমাদের কপোলদেশ ঝুকিয়ে দিলেই চলে না? তোমার নামাযের দাবী কি এত ব্যাপক যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় রীতি-নীতিকেই একেবারে বিসর্জন দিতে হবে এবং দেশের চলমান জীবন ধারার সার্বিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে?

নামায যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কার্যকরী মাধ্যম এ আয়াতগুলো সে কথাই ব্যক্ত করে। বস্তুত নামায মানুষকে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্থক গোলাম বানানোর জন্য প্রস্তুত করে থাকে। এ কথা মনে রাখতে হবে, ঈমানের পরে নামাযই সর্বাগ্রগণ্য দাবী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ-وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ-

আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বাহা-১৪)

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى-وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ-وَهُوَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ-

হে নবী বলুন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হিদায়েতই সত্যিকারের হিদায়াত। তাঁর নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সারা জাহানের মালিকের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও। নামায কায়েম করো, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকো। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রিত হবে?। (আনয়াম-৭১-৭২)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ-

এই কিতাব ঐ সব মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে ও নামায কায়েম করে। (সূরা আল বাকারা-২)

কোরআনের বর্ণানানুযায়ী এক ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ করার পর আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম তার থেকে নামাযকেই দাবী করা হয়। এটা এমন এক আমল যার জন্য শুধু ঈমানই শর্ত হিসেবে রয়েছে। এ জন্য ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা ও নারী-পুরুষ প্রত্যেকের ওপরই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়েছে। নামায ঈমান থাকা না থাকার প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى-وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى-

কিন্তু না সে সত্য মেনে নিল, না সালাত আদায় করলো, বরং সত্যকে মিথ্যা মনে করলো এবং ফিরে গেল। (সূরা আল কিয়ামাহ-৩১-৩২)

কোরআনের এ আয়াতগুলোর বাচনভঙ্গীর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঈমান ও নামায পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বিষয়। অর্থাৎ কেউ ঈমান গ্রহণ করলে সে অবশ্যই নামায কায়েম করবে, অপরদিকে কারো বে-নামাযী হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার অন্তর বে-ঈমানী, দুনিয়া পূজা ও অহংকারে পূর্ণ। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-

فِيْ جَنّٰتٍ-يَتَسَاءَلُوْنَ-عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ-مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ-قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ-

জান্নাতীরা অপরাধী লোকদের জিজ্ঞেস করবে, কোন্ জিনিসটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না। (সূরা মুদ্দাস্সির-৪০-৪৩)

আল্লাহ তায়ালা জান্নাত-জাহান্নাম এই দুটি ঠিকানা যথাক্রমে মু'মিন ও কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নামে যাবার কারণ মানুষের ঈমান ও কুফরী। আখিরাতের জিন্দেগীতে সমস্ত গায়েবী বিষয় যখন মানুষের সামনে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, তখন জাহান্নামীদের এ জবাব যে আমরা নামাযী ছিলাম না বিধায়

জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছি- মূলতঃ এ কথাই প্রকাশ করে যে, নামায ও ঈমান প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস। একই জিনিসের দু'টি বিশেষ দিক। আকীদাগত দিক থেকে ঈমান হলো তাওহীদের স্বীকৃতি, আর আমলের দিক থেকে নামায হলো-তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ। জাহান্নামীদের নামাযী না হবার অর্থ তারা ঈমানদার ছিল না। বস্তুত নামায বঞ্চিত লোক ঈমান থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ–

আমাদের এবং অমুসলিমদের মধ্যে (পার্থক্য সূচিত করে) নামাযের প্রতিশ্রুতি, যে নামায পরিত্যাগ করেছে সেই কুফুরী অবলম্বন করেছে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ–

মুমিন বান্দা আর কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায। (মুসলিম, আবু দাউদ)

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জীবনের সবটুকুই নামাযের বাস্তব অনুশীলন। এই নামাযই মুসলমানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–لَا شَرِيْكَ لَهٗ–

বলো আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যই, তাঁর শরীক কেউ-ই নেই। (আনয়াম-১৬২-১৬৩)

উল্লেখিত আয়াতে চারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে-নামায, কুরবানী, জিন্দেগী ও মৃত্যু। ধারাবাহিকতায় নামাযের মোকাবেলায় জিন্দেগী এবং কুরবানীর মোকাবেলায় মৃত্যুকে রাখা হয়েছে। এভাবে ক্রমিক সাজানোর মধ্যে একটি নিগুঢ় তত্ত্বের দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তা হচ্ছে, নামাযই মূলতঃ জিন্দেগী। যেভাবে আল্লাহর জন্য আমাদের মৃত্যু যা হল কুরবানী, তেমনি আল্লাহরই জন্য আমাদের জিন্দেগী অর্থ আল্লাহর জন্য আমরা নামায কায়েম করবো। যে নামায আদায় করবে না, সে ইসলামের মধ্যে শামিল নেই, এ কথা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ–

এখন যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। (সূরা তাওবা-১১)

সূরা তওবার এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিক, ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও অসন্তুষ্টির ঘোষণার পাশাপাশি ও মু'মিনদেরকে তাদের থেকে নিজেদের সমাজকে পাক-পবিত্র করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শন ও কলুষিত ধ্যান-ধারণা মুসলিম সমাজের ওপর কোনরকম প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোন সুযোগ তাদেরকে না দেয়ার তাকীদ করা হযেছে। কিন্তু এর সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, এখনো যদি তারা নিজেদের কুফরী জিন্দেগী হতে তাওবা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাহলে তাদের কেবল জান-মালের নিরাপত্তাই প্রদান করা হবে না– উপরন্তু তারা মুসলমানদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে। মুসলিম সমাজ তাদেরকে নিজেদের সমাজে মিলিয়ে নেবে। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও এ সমাজে সব রকমের সামাজিক অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সকলক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ সুবিধার সব পথ তাদের জন্যেও উন্মুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, তাদের ঈমানের যথার্থতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই তাদের কার্যতঃ নামায কায়েম করতে হবে ও যাকাত দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের সাক্ষ্য পেশ করা হবে। বস্তুত নামায ও যাকাত ব্যতীত তাদের ঈমান কিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে? কেননা ঈমান তো মৌলিক কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না বরং ঈমান ঐ বিপ্লবাত্মক বাস্তবতা যে, যখন এর শিকড় মানুষের অন্তরের যমীনে মজবুতভাবে প্রোথিত হয়, তখন তার চরিত্রে এমন এক বৃক্ষের জন্ম হয় যার শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে মানুষের গোটা জীবনের ওপর ছায়া ফেলে এবং এর সুমিষ্ট ফলরাজি দ্বারা সার্বিকভাবে সব সময় গোটা সমাজ উপকৃত হতে থাকে।

এমতাবস্থায় কারো ঈমানের যথার্থতা কিসের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যাবে যার ঈমান বৃক্ষের দু'চারটি শাখা, জীবন ও সমাজের ওপর ছায়া ফেলেনি? বস্তুত কাফির মুশরিকদের কুফরী জিন্দেগীর বুনিয়াদী ভ্রষ্টতা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে ঐ নামায থাকে না, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে ও আল্লাহর সার্থক বান্দায় পরিণত করে। এভাবে তাদের জিন্দেগীতে যাকাতও থাকে না যা মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে আল্লাহর বান্দাদের অধিকার ও দাবী পূরণের অনুভূতি জন্মায়।

মুসলমানরা রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করলে তাদের সর্বপ্রথম কাজ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায ও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামে ক্ষমতা গ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো নামায কায়েম করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ–

মুমিনরা সেই লোক যে, তাদেরকে আমি যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে। (সূরা আল হাজ্জ-৪১)

সমাজে নামায ও যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই যে ইসলামী ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য উল্লেখিত আয়াত তা অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে। আর নামায ও যাকাত ব্যবস্থা চালু হবার তাৎপর্য হলো, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে জেনে তাঁর দাসত্বের জীন্দেগীতে অভ্যস্ত হবে এবং দুনিয়া পূজার মত জঘন্য অপতৎপরতা থেকে পাক-পবিত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সচেতনার ব্যাপক বিকাশ ঘটাবে।

মুসলিম শাসক গোষ্ঠী নিজেদের জারি করা আইন বিধানের শুধুমাত্র অনুসরণই করবে না রবং সে আইন পালনের ব্যাপারে তারা নিজেদেরকে এমন পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করবে, যাতে গোটা জাতীর মধ্যে ঐ আইন পালনের সার্থক প্রেরণার উদ্রেক হয়।

মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রে সরকারী সমস্ত ক্ষমতা নামায কায়েম ও সমাজে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ব্যয়িত হবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র নামাযই মানুষকে মহান আল্লাহর সাহায্য লাভের উপযুক্ত পাত্র হিসেবে গড়ে তোলে। পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ–وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا– وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّى مَعَكُمْ–لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ–

আল্লাহ বনী ইসরাইলের নিকট হতে দাসত্বের পূর্ণ ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারজন নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি যদি তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।

বনী ইসরাইলের বারটি গোত্র ছিল। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্ব-স্ব গোত্র হতে একজন করে নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। নকীবের কাজ ছিল নিজ গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম প্রদর্শিত পথের দিকে আহ্বান করা তথা মহান আল্লাহর গোলামী করার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। আর বনী ইসরাইলদের কর্তব্য ছিল এই নকীবদের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পুরাপুরিভাবে প্রতিপালন করা। আল্লাহ তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আমার সাহায্য সহযোগিতা তোমাদের প্রতি তোমাদের নামায কায়েম রাখা অবধি অবশ্যই বলবৎ থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নামায আদায় ত্যাগ করবে, আল্লাহ তায়ালার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

নামায আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস তথা একমাত্র নামাযই মানুষকে মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ-قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً-نِّصْفَه اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً-اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً-اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً-

হে কম্বল আচ্ছাদনকারী। রাত্রিকালে সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে থাকো। কিন্তু কম অর্ধেক রাত্রি কিংবা তা হতে কিছুটা কম করে দাও, অথবা তা হতে কিছু বেশি বৃদ্ধি করে। আর কোরআন থেমে থেমে পড়ো। আমি তোমার ওপর এক দুর্বহ ফরমান পালনের দায়িত্ব অর্পণ করবো। (সূরা আল মুয্যাম্মিল-১-৫)

“ভারী ফরমান পালনের দায়িত্ব” বলে উল্লেখিত আয়াতে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্ব পালন পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্ব পালনের চেয়ে ভারী এবং কঠিন। মহান আল্লাহর বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত এই গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতি পালন করা করো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ জন্য গভীর রাতে একাকী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় নম্রতা সহকারে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নামায আদায় করাই এর জন্য শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র মাধ্যম। এতেই মানুষের মধ্যে ঐ রুহানী শক্তির সৃষ্টি হতে পারে যাতে সে সকল বাতিল শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়পদে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে পারে এবং সর্বপ্রকার নাজুক ও কঠিন মুহূর্তেও দ্বিনী আন্দোলনের কাজ যথাযথভাবে আনজাম

দিতে পারে। নামায ধৈর্য ও দৃঢ়তার একমাত্র উৎস এবং এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন-

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا-اِنَّه بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ-وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ-وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ-اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ-ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ-وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ-

হে রাসূল! তুমি ও তোমার সাথীরা, যারা কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিক ফিরে এসেছে সত্য ও সঠিক পথে অবিচল থাকো, যেমন তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন। এ জালিমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে। তোমরা এমন কোনো পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে। আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছুবে না। আর দেখ, নামায কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করার পথে। আসলে সৎকাজ অসৎ কাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক, তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে। আর সবর করো, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না। (সূরা হুদ-১১২-১১৫)

সূরা হুদ মুসলমানদের মক্কার জিন্দেগীর শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহের একটি। এ সময়টা মুসলমানদের জীবনে চরম পরীক্ষার সময় ছিল। মুসলমানগণ এ সময় নিদারুন অসহায় অবস্থায় জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল। মক্কার কাফির মুশরিকরা এই হকপন্থী লোকদের ওপর মক্কার বিস্তীর্ণ এলাকা সংকীর্ণ করে রেখেছিল।

এই অসহায়ত্ব ও জুলুমের নাজুক অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদের হিদায়াত প্রদান করে বলেন- দেখ, তোমরা যে সত্য দ্বীন গ্রহণ করেছো, তা ঐ আল্লাহর দ্বীন, যার কর্তৃত্বে নিখিল জাহানের সবকিছুই রয়েছে। যিনি সকল শক্তির উৎস। তোমরা সে শক্তিধর মহান আল্লাহর অনুগত সিপাহী। দেখ, ঐ জালিমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ

হয়ে ঘাবড়ে গিয়ে কল্যাণের খাতিরে কোনো সমঝোতার জন্য তাদের প্রতি ঝুঁকবে না। অন্যথায় মনে রেখ, কঠোর নীতিধর আল্লাহর আঘাত হতে তোমাদের রক্ষা করার কেউ নেই। এই আল্লাহ-ই তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও ব্যবস্থাপক। একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। তাঁর প্রেরিত দ্বীনে হকের ওপর একাগ্রচিত্তে মজবুত হয়ে থাক। তাঁরই কাছে ধৈর্য ও দৃঢ়তার জন্যে দোয়া করো নামাযের মাধ্যমে, তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করো। সম্পর্ক তার সাথেই মজবুতভাবে গড়ো যথাযথভাবে নামায আদায়ের মাধ্যমে।

বস্তুত দ্বীনে হকের অনুসরণই উভয় জাহানের কল্যাণের নিশ্চয়তা। অবশ্য এপথ নানা ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ও পরীক্ষার দুর্গম পথ। কিন্তু আল্লাহর অনুগত ধৈর্যশীল বান্দারা পথের এই দুর্গমতা দেখে কখনো হক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয় না। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তোমরা দ্বীনি আন্দোলনের পথের এসব নাজুক অবস্থা ও কাঠিন্য বরদাশত করার শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করো। এই নামাযই ধৈর্য ও দৃঢ়তা সঞ্চয়ের উৎস। এর মাধ্যমেই বান্দার মধ্যে ঐ শক্তি অর্জিত হয় যা তাকে বিরোধিতার তীব্র ঝড় ঝঞ্ঝায় পাহাড়ের মত অনড় অটল করে রাখে।

অতএব তোমরা সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর নামায আদায়ে দাঁড়িয়ে যাও যেন তোমাদের মাঝে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের ঐ অসীম শক্তি সঞ্চিত হয়। ফলে কঠিনতম অবস্থায়ও তোমরা অনড়-অটল থাকতে পারো। আল্লাহভীতি ও নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তাকে সত্যানুসন্ধানী বানায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বচ্ছতা আনে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ–

হে নবী! তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারো যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। (সূরা আল ফাতির-১৮)

আল্লাহর গোলামী ও নামায

প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায একজন মানুষকে এ কথা পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর গোলাম এবং তাকে মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। শুধু মাত্র নামাযের সময়ই মানুষ আল্লাহর গোলাম নয়- নামাযের বাইরের জীবনেও সে আল্লাহর গোলাম, এ কথাটিই নামায মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহকে খুব বেশী পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা জুম'আ-১০)

আল্লাহ তা'য়ালার একনিষ্ঠ গোলাম হওয়ার জন্য এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করার জন্য যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অপরিহার্য, নামায সেসব অপরিহার্য গুণ-বৈশিষ্ট্য কিভাবে মানুষের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখিত আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, নামায আদায় হয়ে গেলে নামাযের স্থানে নীরবে বসে না থেকে পৃথিবীতে জীবন ধারনের উপকরণ যোগাড় করার জন্য কর্মক্ষেত্রে যাও এবং নিজের মনিব আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে তথা নিজেকে মালিকের অনুগত গোলাম হিসাবে গড়তে সক্ষম হবে।

নামায আদায় করার জন্য যখন একজন মানুষ দন্ডায়মান হয়, তখন তার মনে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, সে গোটা সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাশক্তিধর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সে সিজ্‌দা নিবেদন করছে। যা কিছুই সে মুখে আবৃত্তি করছে, তা সবই মহান মালিকের উদ্দেশ্যে। নামাযে সে উঠা-বসা, রুকু-সিজ্‌দা দেয়া ইত্যাদি যা করছে, তার সবটাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ নামাযের মধ্যে সে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহকেই স্মরণে রাখছে। এভাবে নামায মানুষকে এ কথাই জানিয়ে দিলো যে, সে নামাযের মধ্যে যেমন আল্লাহকে স্মরণ করেছে, অনুরূপভাবে নামাযের বাইরের জীবনে প্রত্যেক মুহূর্তে শত

ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর কথা স্মরণ রাখবে। মানুষকে তার মনিব মহান আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য শয়তান ও তার অনুচরবৃন্দ সক্রিয় রয়েছে, অনুরূপভাবে মানুষের মনের মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি নামক শয়তান রয়েছে, সে শয়তানও মানুষকে তার আপন স্রষ্টা আল্লাহর দাসত্ব থেকে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য সক্রিয় রয়েছে।

সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে শয়তানি শক্তি মানুষকে তার মনিব আল্লাহর দাসত্বের পথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। শয়তানের এই সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষের প্রতি ফরজ করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ নামায এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, 'শয়তান তোমাকে প্ররোচনা দিচ্ছে তোমার মালিক আল্লাহ তা'য়ালার অপছন্দনীয় কাজ করার জন্য, কিন্তু তুমি এ কথা স্মরণে রাখো যে, তুমি একমাত্র আল্লাহর গোলাম। তাঁর অপছন্দের কোনো কাজে তুমি নিজেকে জড়িত করবে না।'

একজন মানুষ গোটা রাত ব্যাপী নিদ্রা মগ্ন রইলো, প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হতেই দিনের শুরুতে সমস্ত কাজের পূর্বে ফজরের নামায তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো, 'তুমি আল্লাহর গোলাম।' দিনের আলোয় মানুষ যখন নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে, কাজের ঝামেলায় মন-মানসিকতা বিষিয়ে ওঠে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায মানুষকে আল্লাহর গোলামীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এরপর গোটা দিনের কর্মক্লান্ত শরীর বিশ্রাম পিয়াসী হয়ে ওঠে। নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার কোলে দেহ এলিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তখনও ইশার নামায মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি মহান আল্লাহর গোলাম। এভাবে নামাযই মানুষকে এ কথা বার বার আল্লাহর গোলামীর কথা স্মরণ করাতে থাকে এবং এই পদ্ধতিতেই একজন মানুষকে নামায আল্লাহর ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে সূরা জুমআ'য় নামাযকে যিকর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হলেন মনিব আর মানুষ হলো তাঁর গোলাম, গোলামকে মনিবের আদেশ পালন করতে হবে– এই দায়িত্বানুভূতি নামায মানুষের ভেতরে সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি কাজের জন্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক দেশেরই নানা ধরনের

বাহিনী রয়েছে। এসব বাহিনীকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ না দিলে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে কেউ যদি অনিচ্ছুক হয় বা প্রশিক্ষণ গ্রহণে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।

অনুরূপভাবে নামায হলো একজন মানুষের জন্য প্রশিক্ষণ বিশেষ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মানুষকে আল্লাহর আইন-বিধান মেনে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। নামাযের মাধ্যমে কেউ যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বা অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে তার পক্ষে মহান আল্লাহর গোলাম হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এ জন্যই হাদীসে নামায আদায় করাকে কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে– যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে ব্যক্তি মুসলমানই নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরে কয়েক যুগব্যাপী এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, যারা নামায আদায় করে না অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেবে– এমন কথা কল্পনাও করা যেতো না।

শুধু তাই নয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে আযান শোনার পরে যারা মসজিদে নামাযের জামাআতে শামিল হতো না, তাদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হতো না। স্বার্থের কারণে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, ঐসব মুনাফিকের দলও আযান শোনার পরে মসজিদে নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হতো। কারণ তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত ছিলো যে, মসজিদে এসে নামায আদায় না করলে মুসলমানদের দলে অবস্থান করা যাবে না।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে রাসূলের যুগের মুনাফিকদের নানা ধরনের খারাপ গুণের কথা আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনা একত্রিত করলে এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না, যে আয়াতে বলা হয়েছে– মুনাফিকরা নামায পড়ে না। বরং এ কথা বলা হয়েছে যে, তারা নামায পড়ে বটে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে নামায আদায় করে না। মুসলমানদের দলে শামিল থেকে স্বার্থোদ্ধার করার জন্য একান্ত অনিচ্ছা ও অবহেলার সাথে নামায পড়ে। নামায পড়বে না– অথচ বর্তমান যুগের ন্যায় বেনামাযীকে মুসলমান বলা হবে, এমন কথা সে যুগে কারো চিন্তার জগতেও আশ্রয় পেতো না।

একজন মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জীবনে নিজেকে অসংখ্য কাজের সাথে জড়িত হতে হয় এবং নানাবিধ আচরণ করতে হয়। এই নানাবিধ আচরণ ও অসংখ্য কাজ তাকে করতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ পালন করার প্রশিক্ষণ না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টার জীবনে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। চব্বিশ ঘন্টার জীবনে কোনো মানুষ যদি মাত্র পাঁচবার আল্লাহর আদেশে নামাযই আদায় না করে, তাহলে তার পক্ষে কি করে মহান আল্লাহর অন্যান্য আদেশ পালন করা সম্ভব?

এজন্যই একজন মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জীবনে পাঁচবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেনো তার ভেতরে আল্লাহ তা'য়ালার অন্যান্য আদেশ-নিষেধ পালন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। একনিষ্ঠভাবে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য আদেশ-নিষেধও একনিষ্ঠভাবে পালন করার জন্য তৎপর হবে। আর আযান শোনার পরে যে ব্যক্তি নামাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে নিজের মনিব হিসাবে মানে না, নিজেকে সে আল্লাহর দাস হিসাবে গড়তে ইচ্ছুক নয় এবং আল্লাহর দাসত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নামায অপরাধ থেকে বিরত রাখে

যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না, অথচ মুখে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস আছে বলে দাবি করে, তার এ দাবির পক্ষে কোনো সততা নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ মানে না এবং মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি যার বিশ্বাস নেই, তার পক্ষে নামায আদায় করা এক দুঃসাধ্য কাজ এবং অসহনীয় বিপদ বিশেষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন−

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ-وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ-

নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেও কঠিন নয়, যারা বিশ্বাস করে যে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা-৪৫-৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এই বাধ্যবাধকতায় যার বিশ্বাস রয়েছে তার পক্ষে যথারীতি নামায আদায় করা সামান্যতম কষ্টের কাজ তো নয়ই– বরং জ্ঞান থাকতে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়াই তাদের কাছে পৃথিবীর বুকে সবথেকে কঠিন কাজ। যারা জেনে বুঝে একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করে তাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তার প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে।

আলোয়-অন্ধকারে, লোকালয়ে-নির্জনে, পানির অতল তলদেশে, মহাকাশের উচ্চমার্গে যেখানেই সে অবস্থান করুক না কেনো, সর্বত্রই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখছেন এবং সে কি বলছে তা তিনি শুনছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে সক্ষম হলেও আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করা সম্ভব নয়। অপরাধ করে গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে সে অপরাধ আড়াল করা গেলেও আল্লাহর কাছে তার অপরাধ অজানা থাকে না। পৃথিবীর মানুষের দন্ড থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা গেলেও আল্লাহর দন্ড থেকে নিরাপদ রাখা যাবে না।

একনিষ্ঠভাবে নামায আদায়কারীর মধ্যে নামায এই চেতনাই জাগ্রত রাখে। ফলে তার পক্ষে কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হওয়া সম্ভব হয় না। নামায সৃষ্ট এই চেতনাই মানুষকে অপরাধ মুক্ত রাখে এবং সে মানুষ যে কোনো কর্মের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধের সীমা অনুসরণ করে চলে। জেনে বুঝে যথাযথভাবে সঠিক অর্থে নামায আদায়কারীর নামায সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আন্‌কাবুতের ৪৫ নং আয়াতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ–

নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত)

নামাযের অসংখ্য অবদান রয়েছে, এসব অবদানের মধ্যে এটাও একটি অবদান যে– নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। উল্লেখিত আয়াতে নামাযের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দুটো দিক রয়েছে। এর একটি গুণ হলো অনিবার্য গুণ ও অপর গুণটি হলো কাঙ্খিত গুণ। অনিবার্য গুণ হলো, নামায

মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর কাঙ্ক্ষিত গুণ হলো, নামায আদায়কারী কার্যক্ষেত্রে অশ্লীল, নোংরা বা খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে– এটা কাঙ্ক্ষিত গুণ।

নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে– অর্থাৎ নামায অবশ্যই নামায আদায়কারীকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবেই। নামায আদায়ের পূর্ব প্রস্তুতি ও নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষকে অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখার যতগুলো হাতিয়ার রয়েছে, একমাত্র নামাযই হলো হলো সবথেকে কার্যকর হাতিয়ার।

নামায প্রতিদিন একজন মানুষকে পাঁচবার জানিয়ে দেয় যে, সে পৃথিবীতে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নয়। বরং সে আল্লাহর গোলাম, যিনি তাকে সর্বত্র দেখছেন, তার মনের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প সম্পর্কেও তিনি অবহিত রয়েছেন। মৃত্যুর পরের জীবনে আল্লাহর আদালতে তাকে যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে। এসব কথা নামায মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েই বিরত থাকে না– বরং কার্যক্ষেত্রে নামায আদায়ের প্রস্তুতি ও নামায আদায় কালে সে যেনো গোপনে আল্লাহর কোনো আদেশ অমান্য না করে, সেই প্রশিক্ষণও নামায দিচ্ছে।

নামায আদায়ের পূর্বশর্ত হলো শারীরিক পবিত্রতা, পরনের বস্ত্রের পবিত্রতা ও ওজু করা। কেনো ব্যক্তি মসজিদে নামায আদায়ের জন্য এলে সে ব্যক্তি শারীরিকভাবে পবিত্র কিনা অথবা তার পরিধানের বস্ত্র পবিত্র কিনা বা সে ওজু করেছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার কেনো উপায় নেই। কেউ এ সংক্রান্ত ব্যাপারে কেনো প্রশ্নও করে না।

তবুও যে ব্যক্তি নামায আদায় করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি জেনে বুঝে অপবিত্র দেহে, অপবিত্র বস্ত্রে বা অপবিত্র স্থানে ওজু ব্যতীতই নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। কারণ তার চেতনার জগতে এই ভয় জাগ্রত রয়েছে যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ তা'য়ালা দেখেছেন সে ওজু করেছে কিনা। কেউ না জানলেও আল্লাহ তা'য়ালা জানছেন, তার দেহ ও দেহের পোষাক পবিত্র রয়েছে কিনা।

নামায আদায়কালে যথাস্থানে নিয়ম অনুসারে সে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা এবং বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়েছে কিনা, এসব জানার উপায় নেই। কেউ নামায আদায়কারীকে প্রশ্নও করে না, 'আপনি নামাযে সূবা ফাতিহার পরিবর্তে অন্য সূরা দিয়ে বা কোনো কবির কবিতা দিয়ে নামায শুরু করেননি তো? অথবা সিজদায়

গিয়ে যথারীতি সিজদার তস্‌বীহ্‌ পড়েছেন তো?' তবুও নামায আদায়কারী জেনে বুঝে এ ধরনের কোনো কাজ করে না। যেখানে যে সূরা, দোয়া-দরুদ ও তস্‌বীহ্‌ পড়তে হবে, সেখানে সে তাই পড়ে।

এভাবে একজন মানুষ যখন প্রতিদিন আল্লাহর বিধান অনুসারে নির্ধারিত নিয়মে পাঁচবার যথারীতি নামায আদায় করে. তার অর্থ তো এটাই দাঁড়ায় যে– এই নামাযই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার তার বিবেকে প্রাণ সঞ্চার করছে, তার মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করছে, তাকে দায়িত্ববান মানুষে পরিণত করছে। যে বিধানের প্রতি সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তা মেনে চলার জন্য পৃথিবীতে কোনো প্রহরার ব্যবস্থা থাক বা না থাক, বাইরের কোনো শক্তি থাক বা না থাক এবং পৃথিবীবাসী তার কাজের অবস্থা জানুক বা না জানুক, আল্লাহর ভয়ে এবং নিজের আনুগত্য প্রবণতার প্রভাবাধীনে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে কেনো অবস্থায় সে সেই বিধানই মেনে চলবে, যার প্রতি সে ঈমান এনেছে। নামায এভাবেই একজন মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সুতরাং নামায শুধুমাত্র মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ-গর্হিত কাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে নামায ব্যতীত এমন কোনো দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নেই, যা মানুষকে যাবতীয় অসৎ, গর্হিত ও দুষ্কৃতিমূলক কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এত অধিক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পৃথিবীতে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক ঘন্টার বা কয়েক দিনেরও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অপরাধমুক্ত সমাজ ও প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যেও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাধ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে নানা ধরনের আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু কোনো ধরনের আইন বা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিই মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ন্যূনতম ভূমিকা পালন করতে পারে না। কিন্তু নামায যে প্রশিক্ষণ দেয়, এই প্রশিক্ষণ এত অধিক কার্যকরী যে, মানুষকে গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে।

ইসলামের সোনালী যুগের একটি ঘটনা। দিবাবসানে-গোধূলী লগ্নে একজন সুন্দরী তন্বী যুবতী নারী অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে নির্জন পাহাড়ী পথ বেয়ে একাকী তার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলো। ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। যুবতীর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। সে দ্রুত পদক্ষেপে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। সহসা তার দৃষ্টি পড়লো এক যুবকের দিকে। সুন্দর সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী একজন

যুবক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। অলাঙ্কারাদি লুণ্ঠিত ও ধর্ষিতা হবার ভয়ে যুবতীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে কাঁপতে কাঁপতে পথের ওপরে বসে পড়লো। ধীর পদবিক্ষেপে যুবক ক্রমশ যুবতীর দিকে এগিয়ে এসে তার ভয়বিহ্বলা চোখের ওপরে চোখ রেখে পরম নির্ভরতার কণ্ঠে বললো, 'মা, আমাকে ভয় পেয়ো না, তুমি কোথায় যাবে বলো, আমি প্রহরা দিয়ে নিরাপত্তার সাথে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবো। আমার পরিচয় শোনো, আমি মুসলমান।' এ ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ইতিহাসের পাতা সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। নামায এভাবেই মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রেখেছে।

দ্বীনের কাঠামোয় নামাযের গুরুত্ব

ঈমান আনার অর্থ শুধু মৌখিকভাবে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় যে, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলবো। বরং ঈমান আনার অর্থ হলো, মৌখিকভাবে স্বীকৃতির দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে মহান আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ করা বা বাস্তব আনুগত্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা একান্তই অপরিহার্য। পক্ষান্তরে বাস্তব আনুগত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন হলো নামায।

ঈমান আনার পরে সর্বপ্রথম যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে, সেই ওয়াক্তের নামায যথারীতিভাবে আদায় করার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মুহূর্তকাল পূর্বে ঈমান আনলো, সে এ কথারই স্বীকৃতি দিলো যে– সে শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতিই দিলো না, বরং বাস্তবে এ কথা প্রমাণ করে দিলো যে, সে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে চলবে।

কোনো ব্যক্তি যদি সকাল দশটার সময় ঈমান আনে আর মাত্র দুই তিন ঘন্টা পরে যখন তার কানে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি প্রবেশ করে, তখনই তার ঈমান আনার দাবির স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণ পেশ করার সময় এসে উপস্থিত হয়। মুয়াজ্জিনের আহ্বান শোনার সাথে সাথে যদি ঈমানের দাবিদার উক্ত ব্যক্তি নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে জামাআতে শামিল হয়, তাহলে সে তার ঈমানের দাবির স্বপক্ষে বাস্তবে এ কথার প্রমাণ পেশ করলো যে, উক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে মহান আল্লাহর দাসত্বের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালিত করবে।

আর যদি সে নামায আদায় না করে, তাহলে এ কথারই প্রমাণ দিলো যে, মুখে যে ঈমানের দাবি সে করেছে– তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পৃথিবীতে সে আল্লাহ তা'য়ালার

দাসত্ব করতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। সুতরাং নামায আদায় না করার মূল অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করা। আর আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ত্যাগ করে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবি করার কোনো ইখতিয়ার রাখে না। বেনামাযী কোনো ব্যক্তি মুসলিম সমাজ-সংগঠনের কোনো সুযোগ-সুবিধাও লাভ করতে পারে না।

ঐ ব্যক্তির জন্যই আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি তা মানতে ইচ্ছুক এবং এই বিধানের আনুগত্য করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে আগ্রহী। যে ব্যক্তি নামাযই আদায় করেন না, সেই ব্যক্তি তো এ কথারই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে– সে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে রাজী নয়। আল্লাহর বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি নামায আদায়ের মাধ্যমে এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, সে আপন মনিব আল্লাহর বিধান অনুসারে চলবে। এদিকেই ইংগিত করে আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ–وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ–

তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে। (সূরা ফাতির-১৮)

সুতরাং যাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহর ভয় রয়েছে এবং ভয় যে রয়েছে, এ কথার বাস্তব প্রমাণ যারা দেয় নামায আদায়ের মাধ্যমে, আল্লাহর বিধান শুধু তাদেরই জন্য। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার অর্থই হলো দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জন করা। আর আল্লাহর বিধান অনুসরণের মাধ্যমে যে ব্যক্তি দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জন করবে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করবে। পরকালের নে'মাত তথা জান্নাত ঐসব লোকদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবন-যাপন করতে চায়। এসব লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ–اُوْلٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ–

আর যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। এই লোকেরা সম্মান ও মর্যাদা সহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা মা'আরিজ-৩৪-৩৫)

যারা জান্নাতে যাবে নামায আদায়কারী হওয়াটা তাদের প্রথম গুণ। যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা তাদের দ্বিতীয় গুণ। আর নামাযের সংরক্ষণ করা তাদের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের গুণ। নামাযের 'সংরক্ষণ' বলতে নামায সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্বসমূহ বোঝায়। যেমন যথাসময়ে নামায আদায় করা। নামায আদায়ের প্রস্তুতি হিসাবে দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। অজু সহীহভাবে করা এবং অজুতে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সর্বোত্তমভাবে ধৌত করা, যে স্থানে নামায আদায় করা হবে, সে স্থানের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কিবলা নির্ধারণ করা, নামাযের মধ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা, নামাযের নিয়মাদি ও মূলভাবধারা অনুসরণ করা, নামায যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তার বিপরীত কর্মসমূহ পরিত্যাগ করা, নামাযের উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করে নামাযকে ব্যর্থ করে দেয়া। এ ধরনের অনেক কিছুই নামাযের 'সংরক্ষণ' কথাটির মধ্যে রয়েছে।

নামাযে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করতে হবে। খুশূ-খুযূর বিষয়টি একান্তভাবে মনের সাথে জড়িত আর মনে যখন খুশূ-খুযূর সৃষ্টি হবে, তখন তার প্রভাব বাহ্যিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। কারো বশীভূত হয়ে, কারো সামনে একান্তভাবে নিজের দীনতা-হীনতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। মনের খুশূ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সিজ্দা দেয়ার উদ্দেশ্যে নামাযে দন্ডায়মান হলো অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়ালো, তখন তার গোটা সত্তা জুড়ে এ কথার প্রকাশ ঘটবে যে, সে কার সামনে দাঁড়ালো। মানুষ সাধারণত কোনো প্রতাপশালী ক্ষমতাধর লোকের সামনে গেলে তার সার্বিক আচরণে বিনয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে এই বিশাল আকাশ ও যমিনের মালিক, যিনি অসীম ক্ষমতাধর তাঁর সামনে দন্ডায়মান হলে কতটা বিনয় প্রকাশ করা উচিত।

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, মনের খুশূ হলো, মানুষ আল্লাহর ভয়ে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ভয়ে, তাঁর অসীম প্রতাপ-প্রভাব, ক্ষমতা ও পরাক্রমের কারণে ভয়ে সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করবে। আর শারীরিক খুশূ হলো, মানুষ যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমল ভঙ্গিতে অবনত হয়ে যাবে। দৃষ্টি থাকবে অবনমিত এবং যা আবৃত্তি করবে, তা পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে

আবৃত্তি করবে। সমস্ত কিছুর ওপরে যিনি অসীম ক্ষমতাবান, সেই আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কারণে তার মধ্যে স্বাভাবিক ভীতি সঞ্চার হবে এবং ভয়ের চিহ্ন তার গোটা অবয়বে ফুটে উঠবে।

নামাযের প্রাণই হলো খুশূ– এই খুশূ না থাকলে সে নামায হবে প্রাণহীন দেহের মতো মূল্যহীন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে নামায আদায়রত অবস্থায় দেখলেন, লোকটি তার মুখের দাড়ি বার বার নাড়াচাড়া করছে। তার এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন, যদি তার মনে খুশূ থাকতো, তাহলে তার দেহেও খুশূর সঞ্চার হতো।

খুশূর বিষয়টি যদিও একান্তভাবে মনের সাথে সম্পর্কিত এবং মনে খুশূ সৃষ্টি হলে তার প্রভাব বাহ্যিকভাবে শরীরেও প্রতিভাত হয়। এরপরেও ইসলামী শরীয়াত নামায আদায়ের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করলে নামাযে খুশূ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং খুশূ বৃদ্ধি পেলে বা কমে গেলে নামাযের পদ্ধতিগত দিকসমূহকে একটি বিশেষ মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। যেমন নামাযে তাড়াহুড়া না করা। যেখানে যা তিলাওয়াত করতে হবে তা যথারীতি ধীরে সুস্থে তিলাওয়াত করা। ওপরের দিকে বা ডানে বামে না তাকানো। দৃষ্টি সিজ্দার স্থানে স্থির রাখা। অকারণে কণ্ঠ দিয়ে কোনো রূপ শব্দ করা। পরিধানের কাপড় বার বার নাড়াচাড়া করা। গর্বিত ভঙ্গিতে না দাঁড়ানো।

মোটকথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে নামায আদায় করতে বলেছেন, অনুরূপভাবে নামায আদায় করা। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। (বোখারী ও মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা অর্জন। তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলো নামাযের মধ্যে হারাম করা হয় এবং সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলোকে হালাল করা হয়। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল নামায আদায়কালে মাথা নীচু করতেন এবং তাঁর পবিত্র দৃষ্টি সিজ্দার স্থানে নিবদ্ধ রাখতেন। নামায আদায়রত অবস্থায় তিনি আকাশ বা ওপরের দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা যখন নামায আদায়

করবে তখন এদিক ওদিক দৃষ্টি দেবে না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নিজের চেহারা বান্দার চেহারার দিকে নিবদ্ধ রাখেন। বান্দাহ্ যখনই সিজ্‌দার স্থান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালাও সে বান্দার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন।' (আবু দাউদ)

নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, 'এটা হচ্ছে বান্দার নামাযে শয়তানের ছোবল।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে তিনটি কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। প্রথমটি হলো, দুই সিজ্‌দার মাঝে সোজা হয়ে না বসে মোরগের মতো ঠোকর দেয়া অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে সিজ্‌দা দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো, কুকুর যে ভঙ্গিতে বসে সেই ভঙ্গিতে না বসা এবং তৃতীয়টি হলো, এদিক ওদিক না তাকানো। নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানোকে শিয়ালের তাকানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এমনভাবে তুমি নামায আদায় করো, যেনো তুমি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে না-ও দেখো তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখেন।' এই অনুভূতি মনের মধ্যে জাগ্রত রেখে নামায আদায় করলে সেই নামাযে অবশ্যই খুশূ সৃষ্টি হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে অজু করে বিনয়ের সাথে নামায আদায় করে, ভালোভাবে রুকু করে তাহলে এই নামায তার ছগীরা গোনাহ্‌সমূহের ক্ষতিপূরণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গোনাহ্ থেকে নিজেকে হেফাজত করবে। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল নামাযে কিরাআত শেষ করে দ্রুত রুকুতে যেতেন না। কিরাআত শেষ হবার পরে তিনি ধীর স্থিরভাবে রুকুতে যেতেন। তিনি রুকুতে এমনভাবে পিঠ বাঁকাতেন যে, তাঁর পিঠে পানি ঢেলে দিলেও তা যেনো স্থির থাকে। অর্থাৎ তিনি ধনুকের মতো বাঁকানো ভঙ্গিতে রুকু করতেন না। ধীরে পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি রুকুর তাস্‌বীহ পাঠ করতেন– তাড়াহুড়া করে রুকুর তাস্‌বীহ পাঠ করা যাবে না।

তিনি বলেছেন, 'তোমরা রুকু-সিজ্‌দাহ্ পরিপূর্ণ করো। তুমি যখন তোমার দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রাখবে তখন আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখবে। তারপর একটু থামবে যে পর্যন্ত না প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিজ স্থানে স্থির হয়। তোমার পিঠ সমানভাবে বাঁকাবে।' হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি পিঠ-মাথা উঁচু-নীচু করতেন না। বরং

মাথা পিঠের সাথে সমানভাবে রাখতেন। একদিন তিনি একজন লোককে দেখলেন যে, লোকটি নামাযে রুকু পরিপূর্ণ করছে না এবং সঠিকভাবে সিজ্‌দাও দিচ্ছে না। বরং পাখির মতো ঠোকর দিচ্ছে। লোকটিকে এভাবে নামায আদায় করতে দেখে তিনি বললেন, 'ঐ লোকটি এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল হবে না। সে নামাযে কাকের অনুরূপ ঠোকর দিচ্ছে। যে লোক রুকু পরিপূর্ণ করে না এবং সিজ্‌দায় ঠোকর দেয়, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ক্ষুধার্ত লোকের মতো, যে একটি অথবা দুটো খেজুর আহার করে কিন্তু এতে তার কোনো লাভ হয় না। অর্থাৎ লোকটির ক্ষুধা মিটে না।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নামায চোর হচ্ছে সবথেকে নিকৃষ্ট চোর।' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নামায চুরি করা হয়?' তিনি বললেন, 'রুকু-সিজ্‌দা পরিপূর্ণ না করা।' তিনি আরো বলেন, 'সে ব্যক্তির নামায হয় না, যে রুকু-সিজ্‌দায় পিঠ সোজা করে না।'

আল্লাহর রাসূল ধীর স্থিরভাবে রুকু করতেন এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে তিনি বেশ সময় ব্যয় করে তারপর সিজ্‌দায় যেতেন। তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে এতটা সময় ব্যয় করতেন যে, লোকজন ধারণা করতো তিনি বোধহয় সিজ্‌দায় যাবার কথা ভুলে গিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্তির সাথে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়ে বলেছেন, 'যখন তুমি রুকু থেকে মাথা তুলবে তখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেনো হাড়সমূহ তার গ্রন্থিসমূহের সাথে স্থির হয়ে যায়। এমন না করলে তোমাদের নামায পরিপূর্ণ হবে না।' (বোখারী)

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা সেই লোকের নামাযের দিকে দৃষ্টি দেন না, যে লোক রুকু সিজ্‌দায় পিঠ সোজা করেনা।' (আহ্‌মদ)

তিনি এমনভাবে সিজ্‌দা করতে আদেশ দিয়েছেন, যেন দেহের হাড়ের প্রত্যেকটি গ্রন্থি শান্ত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে বা দৃষ্টিকটু ভঙ্গিতে সিজ্‌দা করতে নিষেধ করেছেন। সিজ্‌দায় প্রশান্তির সাথে সিজ্‌দার তাস্‌বীহ্ তিলাওয়াত করতে হবে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। স্পষ্ট উচ্চারণে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং সিজ্‌দা করা হচ্ছে অর্থাৎ মাথা রাখা হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতী পায়ের ওপরে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা দেয়, তখন সে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং ধীর স্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে

আপন মালিক মহান আল্লাহকে সিজ্‌দা দিতে হবে। কোনো ধরনের ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যাকে আমি কিয়ামতের দিন চিনতে পারবো না।' সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অসংখ্য মানুষের মধ্যে আপনি কি করে চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন, 'ঐ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি, তুমি যদি ঘোড়ার কোনো আস্তাবলে প্রবেশ করো আর সেখানে যদি কালো ঘোড়ার মধ্যে এমন একটি ঘোড়া থাকে যার পায়ের নীচে ও মুখ সাদা থাকে তাহলে তুমি সেটিকে পৃথকভাবে চিনতে সক্ষম হবে না?' সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, 'অবশ্যই চিনতে সক্ষম হবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সিজ্‌দার কারণে তাদের অবয়ব হবে শুভ্র এবং অজুর কারণেও তাদের হাত-পা শুভ্র দেখাবে।' (তিরমিযী)

বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আখিরাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোনো জাহান্নামীর প্রতি করুণা করতে চাইবেন, তখন তিনি ফেরেশ্‌তাদেরকে আদেশ দিয়ে বলবেন, 'যারা আমার ইবাদাত করতো (অর্থাৎ যারা আল্লাহর ইবাদাত করতো বটে কিন্তু গোনাহ্‌গার ছিলো) তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো।' ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর আদেশ পালন করবেন, তাঁরা সিজ্‌দার স্থান দেখে ঐসব লোকদেরকে চিনতে পারবেন, যারা আল্লাহকে সিজ্‌দা দিতো। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা সিজ্‌দার স্থান জাহান্নামের আগুনে পোড়া হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামের আগুন আদম সন্তানের সমস্ত দেহ জ্বালিয়ে দিলেও সিজ্‌দার স্থান জ্বালাতে পারবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর গোটা জমীন আমার উম্মতের জন্য মসজিদ এবং পবিত্র করা হয়েছে। যখন ও যেখানে যে মুহূর্তে নামাযের ওয়াক্ত হবে সেখানেই তার মসজিদ এবং সেখানেই পবিত্রতা। আমার পূর্বের নবী-রাসূলের উম্মতদের জন্য কঠিন নিয়ম ছিলো। তারা শুধুমাত্র গীর্জায় নামায আদায় করতো।

প্রথম সিজ্‌দা দেয়ার সাথে সাথে তাড়াহুড়া করে দ্বিতীয় সিজ্‌দা দেয়া যাবে না। প্রথম সিজ্‌দা যেমন প্রশান্তির সাথে ধীর স্থিরভাবে দিতে হবে, অনুরূপভাবে প্রথম সিজ্‌দা দিয়ে এমনভাবে সোজা হয়ে বসতে হবে যেনো দেহের অস্থিসমূহ যথাস্থানে

লেগে যায়। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল দুই সিজ্‌দার মাঝখানে আরেক সিজ্‌দার সমপরিমাণ সময় ব্যয় করতেন। প্রথম সিজ্‌দা দিয়ে তিনি কখনো কখনো এতটা সময় ব্যয় করতেন যে, লোকজন মনে করতো, তিনি বোধহয় দ্বিতীয় সিজ্‌দা দেয়ার কথা ভুলে গিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ এমন না করলে (অর্থাৎ প্রথম সিজ্‌দা দিয়ে প্রশান্তির সাথে সোজা হয়ে না বসলে) তার নামায পরিপূর্ণ হবে না। (আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দায় যেমন বিভিন্ন ধরনের দোয়া করতেন অনুরূপভাবে প্রথম সিজ্‌দা দিয়ে সোজা হয়ে বসেও দোয়া করতেন। কারণ সিজ্‌দার সময় যে দোয়া করা হয়, তা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল যেভাবে নামায আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে যেভাবে নামাযের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে নামায আদায় করতে হবে, তাহলে অবশ্যই নামাযে একাগ্রতা, বিনয় তথা খুশূ-খুযূ সৃষ্টি হবে। নামাযের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়– এমন কোনো কাজ নামাযের মধ্যে করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নামায আদায়ের সময় যে নিয়ম-নীতি ও আদব-কায়দা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে। নামায আদায়ের সময় জেনে বুঝে নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন চিন্তা-চেতনা ও কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা ধরনের চিন্তা ও কল্পনা মনের জগতে প্রবেশ করা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। মানুষের মন এমন এক জিনিস যা কখনো নীরব থাকে না। কিন্তু নামায আদায়ের সময় পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় মন যেনো আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেনো তারই আর্জি পেশ করে। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহকে দেখছি না কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন এবং আমার প্রত্যেকটি স্পন্দনের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখছেন' এই অনুভূতি নামায আদায়ের সময় হৃদয়ে জাগ্রত রাখলে মন অন্য চিন্তা-কল্পনা থেকে মুক্ত থাকবে আশা করা যায়। নামাযের মধ্যে নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন চিন্তা ও কল্পনা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায় তাহলে যখনই অনুভূতি সজাগ হবে যে, 'আমি নামায আদায় করছি এবং আমার মনে কি কল্পনা হচ্ছে, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা জানতে পারছেন' তখনই অবান্তর চিন্তা-কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত করে নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে, কোনো বিষয় প্রকাশ করা হোক বা গোপন করা হোক এবং মনের জগতে যা কিছু চিন্তা ও কল্পনা করা হয়, সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা'য়ালা হিসাব গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنْ تُبْدُوْا مَافِى اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ-

তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর না-ই করো আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

প্রভাবহীন নামায

জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন তথা সচেতন কোনো মানুষের পক্ষে উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজ করা সম্ভব নয় এবং যে কাজে কোনো ফল পাওয়া যাবে না, এ ধরনের কোনো কাজও কেউ করবে না। অর্থাৎ মানুষ এমন কাজের পেছনেই সময় ব্যয় করে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে, অনিবার্যরূপে যে কাজের ফল লাভ করা যাবে।

সুতরাং যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল নামায আদায়ের ব্যাপারে এত তাগিদ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে নামায আদায়কারীকে অবশ্যই অবগত হতে হবে। কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকলে সেই কাজের বাঞ্ছিত ফল আশা করা বৃথা। যে ব্যক্তি নামায আদায় করছে তার অন্তত নামায সম্পর্কে এতটুকু ধারণা থাকতে হবে, কোন্ সে সত্তা যার উদ্দেশ্যে সে সিজ্দা দিচ্ছে। কোন্ সত্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করছে, নামাযে সে কি পড়ছে এবং এগুলোর অর্থ কি। নামায তাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে, নামায সংক্রান্ত এসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে নামায– নামায আদায়কারীর ওপরে কি করে প্রভাব বিস্তার করবে?

এ কারণেই দেখা যায়, নামায আদায় করে অথচ মিথ্যা কথা ত্যাগ করতে পারেনি। ওজনে কম দিচ্ছে, মানুষকে ঠকাচ্ছে, অপরের স্বার্থ আত্মসাৎ করছে এবং নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছে। এ জন্যই অনেককে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়, নামায কি সত্যই মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, নামায আদায় করার পরও অপরাধ মুক্ত থাকা না থাকা নির্ভর করে নামাযী ব্যক্তি আত্মিক সংশোধন ও পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে নামাযের মাধ্যমে কতটা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে তার ওপর। ব্যক্তি যদি নামায থেকে উপকৃত হবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে এবং এ জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাহলে নামাযের সংশোধনমূলক প্রভাব নামাযী ব্যক্তির ওপরে পড়বে। নতুবা পৃথিবীর কোনো সংশোধন ব্যবস্থা এমন ব্যক্তির ওপর কার্যকর হতে পারে না যে ব্যক্তি সংশোধনমূলক প্রশিক্ষণের প্রভাব গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত নয় অথবা জেনে বুঝে তার প্রভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, একজন ছাত্র যদি নিজেকে ভালো ছাত্র হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয় এবং পরীক্ষায় উত্তম ফলাফল লাভে প্রত্যাশী হয়, তাহলে সেই ছাত্রকে লেখাপড়ার পেছনে সময় ব্যয় করতে হবে। ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক মন্ডলী যে ধরনের পরামর্শ দেন এবং যে পদ্ধতিতে লেখাপড়া করতে বলেন, তা ছাত্রকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। ছাত্র যথারীতি শিক্ষাঙ্গনে গেলো, শিক্ষক মন্ডলী যথাযথ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলেন, কিন্তু ছাত্র তা গ্রহণ করলো না। তাহলে সে ছাত্র কি করে ভালো ফলাফল লাভ করবে? অনুরূপভাবে নামায যে শিক্ষা দেয়, সেই শিক্ষা নামাযী যদি গ্রহণ না করে শুধু নামাযের সময় হলে মসজিদে গেলো আর নামাযের নামে ওঠা-বসা করলো। এই নামায তো ব্যক্তির ওপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে, শরীরের পরিপুষ্টি ও প্রবৃদ্ধির জন্য খাদ্য গ্রহণ একান্তই অনিবার্য। খাদ্য তখনই শরীরের পুষ্টি সাধন করবে, যখন পাকস্থলীকে খাদ্য হজম করার সুযোগ দেয়া হবে। যদি কেনো ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করার সাথে সাথে বমি করে গ্রহণকৃত খাদ্য উদগীরণ করে দেয়, তাহলে খাদ্য কিভাবে দেহের পরিপুষ্টি সাধন করবে? খাদ্য গ্রহণ করে সেই খাদ্য বমি করে ফেলে দিয়ে কেউ যদি খাদ্যের দোষ দেয় যে, 'এই খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি সাধন করতে সক্ষম নয়' তাহলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলা যাবে? এই ব্যক্তি সম্পর্কে তো এ কথাই বলতে হবে, লোকটি খাদ্য গ্রহণ করে না।

সুতরাং নামায আদায় করার পরও যে ব্যক্তি অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে না, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তো এ কথাই বলতে হবে– প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি নামায আদায় করে না। খাদ্য গ্রহণ করেও বমি করে ফেলে দেয়ার অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে ঐ নামাযী ব্যক্তি, যে নামায আদায় করার পরও নিজেকে অসৎ কাজে জড়িত রাখে। এই ধরনের নামাযী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ–

যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তার নামাযই হয়নি। (ইবনে আবী হাতেম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি কথা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন–

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِيْدَ بِهَا مِنَ اللّهِ اِلاَّ بَعْدًا-

যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তাকে তার নামায আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। (তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

لاَصَلوةَ لِمَنْ لَّمْ يَطِعُ الصَّلوةَ وَطَاعَةُ الصَّلوةِ اِنْ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

যে ব্যক্তি নামাযের আনুগত্য করেনি তার নামাযই হয়নি আর নামাযের আনুগত্য হচ্ছে, নামুষ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। (বাইহাকী)

এ জন্য ইমাম জাফর সাদিক (রাহঃ) বলেছেন, নামায আদায়কারী ব্যক্তি তার নামায কবুল হয়েছে কিনা যদি তা জানতে চায়, তাহলে তাকে দেখতে হবে, সেই ব্যক্তি অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে কতটা দূরে অবস্থান করছে। নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, তার নামায কবুল হয়েছে। (রূহুল মা'আনী)

রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশায় রোগী চিকিৎসকের কাছে যায় এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্রানুসারে ওষুধ সেবন করে। রোগী যদি অকাট মূর্খ হয়, তাহলে চিকিৎসকের কাছ থেকে ব্যবস্থা পত্র ভালোভাবে বুঝে নেয়, তারপরও বাড়িতে এসে ওষুধ খেতে যেনো কেনো ভুল না হয়, এ জন্য সে লেখাপড়া জানা ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থা পত্র অনুসারে ওষুধ ব্যবহার করতে থাকে। নিজে ব্যবস্থা পত্র অনুসারে ওষুধ ব্যবহার করলে ভুল হতে পারে, এ কারণেই সে ব্যক্তি লেখাপড়া জানা ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করে।

লেখাপড়া না জানার কারণে নিজে জমির দলীল বুঝে না, এ কারণে অর্থ ব্যয় করে উকিলের সাহায্য গ্রহণ করে। যেনো তার জমি কোনোভাবে অন্যের দখলে চলে না যায়। স্বার্থের কারণে একজন মূর্খ লোকও যদি লেখাপড়া জানা ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে যে নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রেখে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত করবে, সেই নামায সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা কেনো অনুভব করা হবে না?

নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বছরের পর বছর অর্থ ব্যয় করে চেষ্টা-সাধনা করা হয় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য, কিন্তু যে নামায মানুষকে অপরাধমুক্ত রেখে পৃথিবী ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করবে, সেই নামায সম্পর্কে জানার আগ্রহ কেনো থাকবে না? আদালতে আখিরাতে এসব প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে এবং জবাব দিতে ব্যর্থ হবার কারণে গ্রেফতার হতে হবে।

নামাযের মূল উদ্দেশ্য

যথাযথভাবে যদি নামায আদায় করা হয়, নামায যে প্রশিক্ষণ দেয় তা অনুসরণ করা হয় তাহলে সেই নামায অবশ্যই মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার ভয় সৃষ্টি করবে এবং সেই ব্যক্তি যাবতীয় অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, 'আল্লাহ তা'য়ালা হলেন আমার মুনিব এবং আমি তাঁর গোলাম' এ কথা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে হৃদয়ে জীবন্ত রাখার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা নামায কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّنِیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ-وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ-

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কেনো ইলাহ নেই, সুতরাং তুমি আমার দাসত্ব করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বা-হা-১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাযের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর নানা ধরনের হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টি নন্দন দৃশ্যাবলী এবং বিভিন্ন স্বার্থের মোহে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ যেনো কোনোক্রমেই মহান আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে না যায়, সে যেনো সত্য বিমুখ হয়ে না পড়ে এ কথাই চেতনার জগতে শাণিত রাখার উদ্দেশ্যেই নামায ফরজ করে দেয়া হয়েছে। মানুষের মনিব কে এবং মনিবের সাথে কি সম্পর্ক, মনিব তাকে কিভাবে জীবন-যাপন করতে আদেশ দিয়েছেন, সে এই পৃথিবীতে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন নয়– এই চিন্তাকে জীবন্ত ও শাণিত রাখার এবং মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবথেকে বড় মাধ্যম হচ্ছো নামায। প্রতিদিন পাঁচবার মানুষকে পৃথিবীর জটিল কাজকারবার থেকে দূরে সরিয়ে নামায তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে নিয়ে যায়।

নামায ব্যক্তিকে শুধুমাত্র অসৎকাজ থেকেই বিরত রেখেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং সামনে অগ্রসর হয়ে সে সৎকাজে উৎসাহিত এবং সুকৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার জন্য ব্যক্তিকে উদ্যোগী করে। এর কারণ হলো, নামায মানুষের ভেতরে মহান

আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রাখে। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী বলেছেন, 'মহান আল্লাহর স্মরণ নামায পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণের পরিধি এর থেকেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন মানুষ রোজা পালন করে, যাকাত আদায় করে বা অন্য কোনো সৎকাজ করে তখন অবশ্যই সে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করে, কারণ আল্লাহকে স্মরণ করেছে বলেই তো তার দ্বারা ঐ সৎকাজটি সম্পাদিত হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো অসৎকাজ করার সুযোগ লাভ করার পরও তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তখন সেটাও হয় আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণের সুফল। এ জন্য মহান আল্লাহর স্মরণ একজন মুমিনের সমগ্র জীবনে পরিব্যপ্ত হয় আর এই কাজটি সম্পাদিত করে নামায।

নামায এমনই এক জিনিস যা মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়, পবিত্রতার অনুভূতি ও পূণ্যশীলতার নির্মল ভাবধারা এবং আল্লাহর বিধান পালন করে চলার যোগ্যতা ও প্রস্তুতি সৃষ্টি করে সর্বোপরি তাকে সব সময়ই সততার ওপর স্থির করে রাখে। বস্তুত এই জিনিসগুলো না হলে মানুষ কোনোক্রমেই সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর আইন-বিধান পালন করে চলতে পারে না। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে– সে আল্লাহর গোলাম এবং এই কথাই বারবার স্মরণ করে দেয়ার জন্যই আল্লাহ তায়ালা নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا-فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমস্ত লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর তৈরী কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। (সূরা আর রুম-৩০)

মহাসত্য দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হবার পরে সেদিক থেকে দৃষ্টি যেনো শয়তান অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে না পারে, জীবনের জন্য এই সত্য পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কোনো পথের দিকে যেনো দৃষ্টি না যায়, এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াতে বলেছেন– একনিষ্ঠ হয়ে এই দ্বীনের দিকে নিজের দৃষ্টি স্থির করো। আল্লাহর দেয়া দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো এবং এই নামাযই মানুষকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের অনুসারী বানিয়ে দেয়। নামায আদায়ের সাথে নামাযী ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা হতে হবে একজন মুসলমানের মতো এবং তার

যাবতীয় পছন্দ-অপছন্দও হতে হবে মুসলমানের অনুরূপ। তার মূলবোধ ও মানদন্ড হতে হবে সেটাই যা ইসলাম তাকে দিয়েছে। তার স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন ও কার্যক্রমের কাঠামো ইসলামের দাবি অনুসারে হতে হবে। ইসলাম যে পথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনধারা পরিচালনার লক্ষ্যে বিধান দিয়েছে, সেই পথেই নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালিত করতে হবে। কেননা আল্লাহর বিধানের অনুকূল প্রকৃতি দিয়েই মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানব জাতিকে এই প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত তাদের আর কোনো স্রষ্টা, রব, মাবুদ ও আনুগত্য গ্রহণকারী নেই। এই প্রকৃতির ওপরই মানুষের প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোনো মানুষ যখন স্বেচ্ছাচারী নীতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে থাকে, তখন সে তার নিজের প্রকৃতির সাথেই বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। আর যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের দাসত্বের শিকল নিজের কণ্ঠদেশে পরিধান করে, তাহলেও সে তার নিজের সৃষ্টিগত প্রকৃতির সাথে বিরোধিতা করতে থাকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অনুগ্রহ করে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। এখন কেনো মানুষ ইচ্ছে করলেই এই কাঠামোয় কেনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া থেকে মুহূর্ত কালের জন্যও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না এবং অন্য কাউকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মেকী ইলাহ কোনোক্রমেই মানুষের ইলাহ হতে পারে না।

মানুষ নিজের জন্য যতো রব, ইলাহ, মালিক, মনিব, উপাস্য যা-ই ইচ্ছা বানিয়ে নিলেও মানুষ যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বান্দাহ্ নয়– এই বাস্তব সত্যটি অকাট্য ও অবিচল রয়ে যায়। মানুষ নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে যাকে ইচ্ছা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার ধারক গণ্য করতে পারে এবং মন চায় তাকে নিজের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার মালিক মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য এটাই যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কেউ নয়। কেউ তাঁর অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার শক্তিও একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ–

আল্লাহ অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো আর নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যেয়ো না। (সূরা আর রূম-৩১)

আল্লাহর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো– এ কথা বলার পরেই বলা হয়েছে, নামায কায়েম করো। আল্লাহ অভিমুখী হওয়া ও তাঁকে ভয় করা, এ দুটো কাজের কেনো বাহ্যিক রূপ নেই। এই দুটোই কাজ নির্ভর করে মানসিকতার ওপরে। অর্থাৎ কাজ দুটো একান্তভাবেই মানসিক কাজ। একজন আল্লাহ অভিমুখী হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করছে– এই মানসিক অবস্থার প্রকাশ এবং এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনিবার্যভাবে এমন কেনো শারীরিক কর্মের প্রয়োজন যার মাধ্যমে বাইরের দিকে এর প্রকাশ ঘটবে এবং লোকেরা জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতেও আল্লাহ ভীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করার এই অবস্থাটি একটি কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে বিকাশ লাভ করতে থাকতে। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তার মানসিক দিকে পরিবর্তন ঘটানোর আদেশ দেয়ার পর পরই নামায নামক শারীরিক কর্ম সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছেন।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো চিন্তা নিছক চিন্তার পর্যায়েই থাকে ততক্ষণ তারমধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। এই চিন্তা যদি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সময়ের ব্যবধানে সেই চিন্তায় ভাটা পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং চিন্তায় পরিবর্তন আসারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু চিন্তা অনুসারে তৎক্ষণাত কর্ম বাস্তবায়ন করতে থাকে তখন মানুষের মধ্যে সেই চিন্তা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ করে, মনের জগতে সেই চিন্তা ক্রমশ শিকর গেড়ে বসে যেতে থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে যখন সেই চিন্তা অনুসারে বাস্তবে কর্ম সম্পাদন হতে থাকে, ততই তার শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে যে আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা করেছে, তা পরিবর্তিত হওয়া এবং তা ম্রিয়মান হয়ে পড়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে যেতে থাকে এবং চিন্তা অনুসারে যে কাজের সূচনা করেছে, সেই কাজ থেকে দূরে সড়ে আসা দূরহ হয়ে পড়ে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নিজেকে আল্লাহ অভিমুখী করা এবং হৃদয়ে আল্লাহ ভীতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যেক দিন নিয়মিত যথাযথ পন্থায় পাঁচবার নামায আদায় করার চেয়ে অধিক কার্যকর পন্থা আর দ্বিতীয়টি নেই। নামায কেনো এত কার্যকরী, কারণ রোজা-হজ্জ বা যাকাত নির্দিষ্ট একটি সময়ে সম্পদান করতে হয়। রোজা বছরে একবার, হজ্জ জীবনে একবার ফরজ, যাকাতও বছরের একবার আদায় করতে হয়। কিন্তু নামায এমন একটি কাজ যা নিয়মিতভাবে চব্বিশ ঘন্টার

মধ্যে কয়েক ঘন্টা পর পর একটি নির্দিষ্ট বাহ্যিক অবয়বে মানুষকে স্থায়ীভাবে আদায় করতে হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা মানুষের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা কোরআন দিয়েছে, সেই কোরআন ব্যতীত নামায হবে না।

অর্থাৎ নামাযে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে। এই কোরআন ইসলামের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেশ করেছেন, তা যেনো মানুষ ভুলে না যায় এ জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ নামাযে প্রত্যেক রাকাআতে প্রতিদিন পাঁচবার কোরআন তিলাওয়াত করতে হয়, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ নামাযে বারবার পড়তে হয়। ফলে মানুষের আল্লাহ তা'য়ালার একত্বের কথা, তাঁর রাসূলের কথা, তাঁর আদেশ-নিষেধের কথা বারবার মানুষের মনে জীবন্ত হতে থাকে।

এ ছাড়াও মানব জাতির ভেতর থেকে কারা তাদের মনিব আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করে ও কারা বিদ্রোহের নীতি পরিহার করে আপন মনিব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে এবং কারা কাফির ও কারা মুমিন তা প্রকাশ পাওয়ার জন্যেও নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজের কাছে এ কথা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, কে তাদের শত্রু ও কে তাদের মিত্র এবং নামাযই এই পার্থক্যবোধ স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সত্যপন্থী মানুষকে সবসময় অন্যায় আর পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়– সংগ্রাম করার এই শক্তিও নামাযই সৃষ্টি করে দেয়।

যেসব অন্যায় ও পাপাচার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে আর এর গতি রোধ করার লক্ষ্যে সত্য দ্বীনের দাওয়াত যারা দিচ্ছে এবং তাদের সাথে বিরোধিতা করা হচ্ছে, এসব বিরোধিতার মূল উপ্ড়ে ফেলার প্রকৃত পথ হলো, সত্য দ্বীনের দাওয়াত দানকারীকে সর্বাধিক নেক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং তার নেক আমল দ্বারা অন্যায়কে পরাজিত করতে হবে। আর দাওয়াত দানকারীকে নেক বানানোর সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নামায। নামায আদায় করার কারণে তার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ নিত্য-নতুন ও জীবন্ত করতে থাকবে এবং এই শক্তির মাধ্যমে সে পাপাচারের সংঘবদ্ধ ঝটিকার শুধু মোকাবেলাই করতে পারবে তা নয়– বরং তা উৎখাত করে পৃথিবীতে কার্যত কল্যাণ ও মঙ্গলময় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর রাসূল যে নামায আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যে নামায আদায় করেছেন এবং কোরআন ও সুন্নাহ যে নামায আদায় করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে, সেই

নামায যেমন নামাযী ব্যক্তিকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে অনুরূপভাবে সমাজ থেকে অসৎকর্ম উৎখাত করতে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায়। এ কারণেই আল্লাহ বিমুখ ও পাপাচারে নিমজ্জিত সমাজের লোকজন নামাযী ব্যক্তির প্রতি বিদ্রুপ বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কেননা নামায হলো দ্বীনদারীর সর্বাধিক স্পষ্ট নিদর্শন এবং পাপাচারে লিপ্ত দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকজন এই দ্বীনদারীকে মারাত্মক বিপজ্জনক এক রোগ বলে মনে করে। এ কারণে যে সমাজে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোত প্রবহামান, সেই সমাজের লোকেরা নামাযকে সর্বোত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ হিসাবে গ্রহণ না করে নিছক 'পরহেযগারীর লক্ষণ' হিসাবে গণ্য করে। যদিও তারা পরহেযগারীর অর্থ বুঝে না। এই সমাজের কাউকে নামায আদায় করতে দেখলে তাকে 'মোল্লা' রোগে আক্রান্ত হয়েছে-বলে ধারণা করা করে এবং তাকে নানা ধরনের বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করতে থাকে।

কারণ তারা জানে, এই লোকটি এখন আল্লাহ মুখী হয়েছে, সে নিজে যেমন ভালো থাকতে চেষ্টা করবে এবং সমাজকেও ভালো বানানোর চেষ্টা করবে। নামাযী লোকটি ধর্মহীনতা ও চরিত্রহীনতার ওপর সমালোচনার আঘাত হানবে। সঠিক পথ অবলম্বন ও চরিত্র গড়ার উপদেশ দিতে থাকবে এবং এই লোকটি সমাজের যাবতীয় দুষ্কৃতির দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে মানুষকে সচেতন করে দেবে। সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন-নিষ্পেষণ উৎখাত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করবে।

আর এই লোকের অনুরূপ সমাজের সমস্ত লোক যদি নামাযের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পাপচারে লিপ্ত দুষ্কৃতকারী লোকদের অন্যায় পথে অর্থের পাহাড় গড়া, পরস্বার্থ হরণ করা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ করা যাবে না– যে কাজের ওপরে তাদের ভোগ-বিলাসিতা নির্ভর করে। এ কারণেই দেশ ও সমাজদ্রোহী লোকেরা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসন দখল করে। তারপর সমাজে নগ্নতা আর বেহায়াপনার প্লাবন সৃষ্টি করে মানুষের মন-মানসিকতা আল্লাহ বিমুখ করে দেয়।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে ছেলেটি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতো, সেই ছেলেটি যখন কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে তারুণ্যের সোপানে পা স্পর্শ করলো, তখনই সমাজে প্রবাহিত নগ্নতার বাতাস তাকে স্পর্শ করলো। অর্থহীন সাহিত্য, নগ্ন পত্র-পত্রিকা, যৌন উত্তেজক গান-বাজনা আর ছায়াছবি ছেলেটির

কণ্ঠদেশ থেকে আল্লাহর গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করে দিলো। এই ছেলেকে আর মসজিদে পাওয়া যায় না। দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে যেসব দুর্বৃত্ত সমাজ পরিবেশকে নামায আদায়ের বিপরীত পথে তাড়িত করেছে, সেই সব দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا–

তারপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামায নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো। তাই শীঘ্রই তারা পথভ্রষ্টতার পরিণামের মুখোমুখি হবে। (সূরা মারয়াম-৫৯)

দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে এসব দুর্বৃত্ত গোটা দেশ ও সমাজের পরিবেশ এমনভাবে বিষাক্ত করে তোলে যে, সেখানে নামায আদায় করার যাবতীয় পরিবেশ তারা ধ্বংস করে ছাড়ে। চিত্ত বিনোদনের নামে গান-বাজনা, নানা ধরনের খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি এমনভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেয় যে, এসব কিছুর সাথে যারা জড়িত হয় এবং যারা এসবের দর্শক-শ্রোতা, তারা এমনভাবে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেয় যে– নামায আদায় করার মতো অবসর তাদের হয় না।

নামায থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ সম্পর্কে বেপরোয়া ও গাফেল হয়ে যাওয়া আর এটাই হলো মুসলিম মিল্লাতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম সূচনা। কারণ নামায মহান আল্লাহর সাথে মুসলমানের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্কের বাঁধন অটুট রাখে। এই সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। সম্পর্কের এই বাঁধন ছিন্ন হবার সাথে সাথেই মানুষ মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এভাবে কার্যকর সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন হবার পরেই মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান নামায আদায় করে না, ফলে তাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার যেমন কার্যকর কেনো সম্পর্ক নেই অনুরূপ মানসিক সম্পর্কও নেই। সুতরাং এই ধরনের মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী অপমানিত আর লাঞ্ছিত হলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, এই ধারণা করাও বড় ধরনের বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

নামায আদায়ের পূর্ব শর্ত

নামায আদায় তথা নামাযে দন্ডায়মান হবার পূর্ব শর্ত হলো, প্রস্তুতি গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রথমে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। দৈহিকভাবে পবিত্র হতে হবে এবং পরিধেয় বস্ত্রও পবিত্র হতে হবে। যে স্থানে নামায আদায় করা হবে, সেই স্থানও পবিত্র হতে হবে। কেউ যদি জেনে বুঝে অপবিত্র দেহে, পোষাকে বা অপবিত্র স্থানে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায তো হবেই না, সেই সাথে ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামায গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ-

এবং নিজের পরিধেয় পোষাক পবিত্র রাখো। আর মলিনতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে অবস্থান করো। (সূরা আল মুদ্দাস্সির-৪-৫)

বিজ্ঞ তাফসীরকারগণ কোরআনের এই আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াতের মর্মও বড় ব্যাপক। ছোট একটি কথা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটা অর্থ হলো, পরিধেয় পোষাক পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা। পোষাক মানুষের মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর বিশেষ পোষাক নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষকগণ বলেছেন, পোষাক-পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং আত্মার পবিত্রতা অবিচ্ছিন্ন। একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পবিত্র রুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সে পুঁতিগন্ধময় কোন খাদ্য তাঁর মুখ গহ্বর দিয়ে দেহে প্রবেশ করাবে। সুতরাং, কোন পবিত্র আত্মার পক্ষেও সম্ভব নয় সে কোন অপবিত্র দেহের ভেতরে বাস করবে। কোন পবিত্র দেহের পক্ষেও সম্ভব নয় সে নিজেকে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি অপবিত্রতা প্রশ্রয় দেননা।

আরবী 'তাহ্হের বা তাহারাত' শব্দের অর্থ শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয়। অন্তরের কলুষতা দূর করাকেও বোঝায়। পবিত্রতা বা তাহারাতকে কোরআন যে অর্থে উপস্থাপন করেছে, পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যে, সে ভাষার একটি শব্দ তাহারাতের সমার্থক হতে পারে বা পবিত্রতার ব্যাপক ধারণা পেশ করতে পারে।

পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও পবিত্রতা এবং পাপের ভেতরে নিজেকে জড়িত করাকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কোন অন্যায় কাজ বা মিথ্যা কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখার অর্থও হলো পবিত্রতা। মিথ্যা কথা বলা অপবিত্রতা।

এভাবে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, অত্যাচার, অপরিচ্ছন্নতা, মিথ্যা, চিন্তার জগতে অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাকেই পবিত্রতা বলা হয়েছে। দেহ এবং দেহের পোষাক পবিত্র–এটা তো বাহ্যিক পবিত্রতা মাত্র। চিন্তার জগৎ হতে যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা এবং অপবিত্রতা দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা তথা মূর্খতাও এক ধরণের অপবিত্রতা। এ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার নামই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাহারাত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং পবিত্র এবং পবিত্রতা তিনি ভালোবাসেন– এ কথা পবিত্র কোরআনে তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা-২২২)

শুধুমাত্র নামায আদায় করার পূর্বেই নয়– প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শারীরিক ও পোষাকের দিক থেকে পবিত্র থাকতে হবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। প্রকৃতপক্ষে পবিত্রতা হলো সেইসব ভিত্তিসমূহের একটি, যেসব ভিত্তির ওপর আল্লাহর তা'য়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইসলাম একটি সুন্দর ও পরিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন জীবন বিধান। এর কাঠামোর বাইরের দিক যেমন সুন্দর ও পবিত্র, অনুরূপভাবে এর ভেতরের দিকও অতিব পবিত্র এবং সুন্দর। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্রতা অর্জনের প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে। সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ-وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ
فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ-

ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের নিকটে গমন করো না

যতক্ষণ না তারা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের কাছে যাও, ঠিক সেইভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا-

আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে পবিত্র হয়ে নাও। (সূরা মায়িদা-৬)

وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা-২৫)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ-

চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গী। আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা তারা সৌভাগ্যমন্ডিত। (সূরা আলে ইমরাণ-১৫)

পবিত্রতা একদিকে যেমন ঈমানের অংশ, অপরদিকে তা মুসলিম হবারও অন্যতম শর্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম মানুষকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলাম কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন, ইসলাম হলো– তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো আদেশদাতা নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত পরিশোধ করবে, হজ্জ আদায় করবে, উমরাহ্ করবে, অপবিত্রতা দূর করার জন্য গোসল করবে, অযু পূর্ণ করবে, রমযানের রোযা পালন করবে। হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম জানতে চাইলেন, এগুলো আদায় করলে কি আমি মুসলিম হতে পারবো? আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আল্লাহর ফেরেশ্‌তা বললেন, আপনি সঠিক কথাই বলেছেন। (বোখারী)

সুতরাং ইসলামে পবিত্রতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা, তা উল্লেখিত কোরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস থেকেই অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মানুষকে পবিত্রতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণাই দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত কোনো মতবাদ-মতাদর্শ বা ধর্মের নামে যেসব মত, পথ ও প্রথা পৃথিবীতে চলে আসছে, এসব আদর্শ বা ধর্মে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কোনো গুরুত্ব নেই। বরং ধর্ম নামে পরিচিত কতক ধর্মে অপবিত্র বস্তু বা অপবিত্রতা ব্যতীত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানই

পালন করা নিষিদ্ধ। স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে তারা যে সাধনার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, সেই সাধনা করতে হলে নানা ধরনের অপবিত্র বস্তু প্রয়োজন– এমনকি মদ ও নারীর ঋতুস্রাবের রক্তের মতো অপবিত্র বস্তুরও প্রয়োজন হয়।

সারা পৃথিবীর মানুষকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। দাঁত পরিষ্কার করতে হবে, গোসল করতে হবে, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর কুলুপ ও পানি ব্যবহার করতে হবে; দেহ থেকে বীর্য নির্গত হলে গোসল করতে হবে, চুল, দাড়ি-গোঁফ সুন্দর করে কেটে চিরুনী ব্যবহার করতে হবে, দেহের অপ্রয়োজনীয় পশম পরিষ্কার করতে হবে, পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে হাত ধুতে হবে, বাসন-পত্র পরিষ্কার করতে হবে, দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। মুসলিম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মানব সম্প্রদায় এখন পর্যন্ত পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ ধারণা পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। এসব লোক যেসব দেশে বাস করে, সেসব দেশ ভ্রমণ করলে ও তাদের সাথে মেলামেশা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, পবিত্র-পরিচ্ছন্নতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের কতটা দৈন্যতায় তারা জীবন-যাপন করে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এসব লোক মুখ না ধুয়েই চা পান করে থাকে। পশ্চিমা সভ্যতায় এর নাম দেয়া হয়েছে বেড-টি।

পক্ষান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য রয়েছে, এমন কোনো পাত্র উন্মুক্ত রাখতে নিষেধ করেছেন। পাত্র খোলা থাকলে এর মধ্যে নানা ধরনের পোকা-মাকড় বা অখাদ্য কিছু পড়তে পারে। তিনি বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন নিজের হাত পরিপূর্ণ পাত্রে না ডুবায়। যতক্ষণ না সে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবে তিনবার। (মুসলিম)

পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম এতটা গুরুত্ব দিয়েছে যে, গোসল আর অযু করে পবিত্র হবার জন্য প্রয়োজনীয় পানির অভাব দেখা দিলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে বলা হয়েছে। মাটি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিকে ইসলাম তায়াম্মুম নামে অভিহিত করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলেছেন–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا–

অতপর যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো। (সূরা নিসা)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا-وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার ওপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে। অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও অথবা পথে-প্রবাসে থাকো বা তোমাদের কোনো লোক মল-মূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ করো আর যদি পানি পাওয়া না যায়, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তার ওপর হাত রেখে নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ্ করে নাও। (সূরা মায়িদা-৬)

পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করার গুরুত্ব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি পবিত্রতা গ্রহন করে এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে এরপর এভাবে পবিত্রতাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তার এই নামাযসমূহ প্রতি দুই ওয়াক্ত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন–

مَنْ تَوَضَّا فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ-

যে ব্যক্তি অযু করে। পূর্ণ নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে অযুকে পূর্ণ করে। তার দেহ থেকে তার সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় তার নখের নিচে থেকে পর্যন্ত। (বোখারী-মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন– অযুর পরিপূর্ণতার কারণে কিয়ামতের দিন তোমরা হস্ত ও মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতার অধিকারী হবে। (বোখারী- মুসলিম)

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব কাজের কথা বলবো না, যেসব কাজ করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন? সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন– সেসব কাজ হলো, কষ্ট এবং মন না চাইলেও অযু পূর্ণ করা। মসজিদে যেতে অধিক অধিক পা ফেলা এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ হলে অন্য ওয়াক্ত নামায আদায় করার অপেক্ষায় থাকা। এটা হলো তোমাদের জন্য প্রকৃত রিবাত। (মুসলিম)

শেষের কথাটি তিনি দুই বার উচ্চারণ করেছেন। আরবী ভাষায় রিবাত বলা হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়ার লক্ষ্যে নির্মিত ছাউনীকে। অর্থাৎ এসব ছাউনী থেকে যেমন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়, অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত উক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করলে একজন মুসলমান শয়তানের আক্রমণও প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম প্রত্যেক নারী-পুরুষের নিকটই পবিত্রতা দাবি করে এবং এ ব্যাপারে উভয়ের জন্য একই নির্দেশ দিয়েছে। অপবিত্রতার অবস্থা যদি এমন হয় যে, যা গোসল না করা পর্যন্ত দূর হবে না, তাহলে নারী-পুরুষ উভয়কেই ইসলাম গোসলের নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে গোসল না করে অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় দূরে থাক– নামাযের ধারে কাছেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

যে স্থানে নামায আদায় করা হবে, সেই স্থানও পবিত্র হতে হবে। জেনে বুঝে অপবিত্র স্থানে নামায আদায় করলে নামায যেমন হবে না, তেমনি ব্যক্তিকে গোনাহ্গার হতে হবে। ইসলাম এভাবে মানুষকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে আকৃষ্ট করেছে। পরিধেয় বস্ত্র তা কম মূল্যের বা পুরনো হোক না কেনো, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মসজিদে নববীতে বসে আছেন। একজন সাহাবী মলিন পোষাকে অবিন্যস্ত চুলে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম জানালেন। তিনি সালাম জবাবের না দিয়ে বললেন, এই ব্যক্তির কি পোষাক পরিচ্ছন্ন করার মতো কিছু জুটে না? মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচ্ড়াতে পারে না? আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে ঐ ব্যক্তি দ্রুত সেখান থেকে বাড়িতে গিয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে এবং মাথার চুলগুলো সুন্দরভাবে আঁচড়িয়ে নবীজীর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম জানালেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, দেখোতো– এখন তোমাকে কি সুন্দর লাগছে! আর একটু পূর্বে তোমাকে শয়তানের মতো দেখাচ্ছিলো।

অনেকে বাড়িতে একাকী যখন নামায আদায় করে, তখন এমন পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করে, যে পোষাক পরিধান করে সেই ব্যক্তি বাড়িতে আগত কোনো অতিথির সামনে উপস্থিত হন না। মানুষ সাধারণতঃ কোনো সম্মানিত মর্যাদাবান ব্যক্তি বা উচ্চ পদস্থ কারো সাথে দেখা করতে যাবার সময় নিজেকে যথাসম্ভব উত্তম পোষাকে সজ্জিত করে, চুল-দাড়ি পরিপাটি করে তারপর অভিষ্ট ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু যে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদার অধিকারী, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে যখন দাঁড়ানো হয়, তখন নিজেকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করা এবং নিজেকে পরিপাটি করে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না। এটা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে উদাসীনতার শামিল।

এটা করা যাবে না, বরং নামায আদায় করতে হবে, উত্তম পোষাক পরিধান করে। হাদীসে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন সর্বোত্তম পোষাকে উপস্থিত হবে।' সামর্থ থাকার পরও ময়লাযুক্ত পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা মহা অন্যায় এবং এ জন্য আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা কৃপণতা পছন্দ করেন না। এই কৃপণতা আল্লাহর ক্ষেত্রে হোক বা তাঁর বান্দার ক্ষেত্রেই হোক। আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ-وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

সেই সব লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা কার্পণ্য করে এবং অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন, তা গোপন রাখে। এ ধরনের অকৃতজ্ঞ-নি'মাত অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (সূরা নিসা-৩৭)

মহান আল্লাহর নি'মাত গোপন করে রাখার অর্থ হলো, এমনভাবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করা, দেখলে যেন মনে হয় যে, এই লোকটির প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোনো ধরনের অনুগ্রহ করেননি। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে নিজের সামর্থ থাকার পরও এমন নিম্নতম মানে জীবন-যাপন করে, দেখলে মনে হবে এই লোকটির চেয়ে হতদরিদ্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই। সে নিজের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে না, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে না, এমনকি মহান আল্লাহর রাস্তায় একটি কানাকড়িও ব্যয় করে না। তার পরনের

পোষাক ও চাল-চলন দেখলে মনে হবে, সে দরিদ্রতার নিম্ন সীমায় অবস্থান করছে। মূলত এর চেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা আর কিছুই হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে নি'মাত দেন, তখন তিনি তার ওপর সেই নি'মাতের বাহ্যিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে ভালোবাসেন।' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির দৈনন্দিন আহার, পোষাক ও দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দেয়া নি'মাতের প্রভাব দেখতে চান। সুতরাং অবহেলিত বা অন্যের সামনে যে পোষাক পরিধান করে উপস্থিত হতে লজ্জানুভব হয়, এমন পোষাক পরিধান করে মহান আল্লাহর সম্মুখে তথা নামাযে দন্ডায়মান হওয়া যাবে না।

সুতরাং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো মহান আল্লাহর গোলামদের গুণ-বৈশিষ্ট্য। আর অপবিত্রতা হলো শয়তান ও তার অনুগামীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য। নামায আদায় করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহকে সিজ্‌দা করা তথা মহান আল্লাহর দাসত্ব করা হবে– এই স্বীকৃতি প্রদান করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি তাঁর গোলামদেরকেও পবিত্র দেখতে চান। তাঁর সমীপে অপবিত্রতার স্থান নেই এবং অপবিত্র অবস্থায় তাঁকে সিজ্‌দা দেয়ারও অবকাশ নেই। সুতরাং নামায আদায়ের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন এবং এই পবিত্রতা শুধুমাত্র বাইরেরই নয়– ভেতরের দিক থেকেও মানুষকে পবিত্র হতে বলা হয়েছে। মানুষ কল্পনার জগতে যেন অপবিত্রতার কোনো স্থান না দেয়, এ জন্য পবিত্র কোরআনের মহান আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মনে যেসব কল্পনার উদ্রেক হয়, সে সম্পর্কেও অবগত আছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَنَّ اللّٰهَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ–

আল্লাহ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাগাবুন-১৮)

মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্ মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ–

তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সূরা নাম্ল-৭৪)

اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ–

বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ তা'য়ালা কি তা সম্যক অবগত নন? (সূরা আনকাবুত-১০)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِه نَفْسُه–وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ–

আর আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার কাছে তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। (সূরা কাফ-১৬)

মানুষে একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাই আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে। সূরা মুজাদালায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ–مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ وَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا–ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ–

তুমি কি অনুধাবন করো না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'য়ালা তা জানেন, তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যেখানে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না– যেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে যিনি উপস্থিত থাকেন না, তারা এর চেয়েও কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেনো, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। তারা যা কিছু করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। (আয়াত-৭)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ السَّمٰوتِ وَمَا فِى الاَرْضِ-مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ وَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا-ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمُ-

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কেনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আনআম-৫৯)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু-পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। (সূরা ইউনুস-৬১)

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ-وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জানো যা আমরা গোপন করি ও প্রকাশ করি। আকাশ ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (সূরা ইবরাহীম-৩৮)

এসব কথা এজন্যই বলা হয়েছে, মানুষ যেন শুধুমাত্র দৈহিক তথা বাহ্যিক পবিত্রতাই অর্জন না করে, মনের পবিত্রতাও অর্জন করে। মনের জগতে কোনো ধরনের অপবিত্রতা তথা পাপ-পঙ্কিলতা যেন স্থান না দেয়। তবুও মানুষের মন– সামান্য অসতর্ক হলেই নানা ধরনের পাপ-কল্পনা তথা অপবিত্রতা এসে মনের জগতে ভীড় জমায়। মনের জগতের এই অপবিত্রতার বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয় এবং এ ব্যাপারে তিনি আখিরাতের ময়দানে বান্দার কাছে জানতে চাইবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ-فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ-

তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর না-ই করো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সেই সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

সুতরাং নামাযের প্রথম শিক্ষা হলো, দেহ-মন ও পোষাকের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র ও রুচিবান করে গড়ে তোলা। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি পবিত্র ও রুচিবান হয়, তাহলে সেই সব ব্যক্তি সমষ্টিগতভাবে যে সমাজ গড়বে, সেই সমাজও পবিত্র তথা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ অপরাধমুক্ত সমাজ গঠিত হবে। এভাবে অপরাধমুক্ত সমাজের সমন্বয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হবে, সেই রাষ্ট্রই কেবলমাত্র শোষণ মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী ও নিরাপত্তাপূর্ণ রাষ্ট্র হতে পারে।

নামাযের সূচনাতে কি ওয়াদা করা হচ্ছে?

নামাযের প্রথম শর্ত আদায় হবার পর নামায আদায়ের স্থানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই পাঠ করা হয়–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

আমার মুখমন্ডলকে আমি ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন'য়াম-৭৯)

নামায আদায়ের সূচনাতেই সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করে তারপর নামাযের জন্য হাত বাঁধা হয়। যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈগণ কোরআনের এই আয়াত নামায আদায়ের পূর্বে নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করেছেন বলে জানা যায় না। কোরআনের যে আয়াত তিলাওয়াত করে নামাযের সূচনা করা হয়, এই আয়াতে বলা কথাগুলো মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহীমের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই কথাগুলো পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহীমকে যে জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রেরণ করেছিলেন, সেই জাতি ছিলো পথভ্রষ্ট। তারা মহান আল্লাহর গোলামী ত্যাগ করে আল্লাহর সৃষ্ট আগুন, পানি, মাটি, বৃক্ষ, পাথর, আকাশের চন্দ্র-সূর্য ও তারকামালার পূজা উপাসনা করতো। এসবকেই তারা অসীম শক্তিশালী কল্পনা করে নিজেদের আবেদন-নিবেদন পেশ করতো। আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত দেশের নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কল্পনা প্রসূত নীতি আদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিতিমালা পরিচালিত হতো। এক কথায় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন অনুসরণ করা হতো, তা ছিলো মানুষের বানানো। আর ধর্মীয় দিক থেকে অনুসরণ করা হতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি-পদ্ধতি।

১৯০৩ সনের পরে C. H. W. John কর্তৃক লিখিত The oldest code of Law নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম যে জাতির মধ্যে আগমন করেছিলেন, সেই জাতির মধ্যে শির্ক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূর্তি পূজা সমন্বিত আরাধনা -উপসানার সমষ্টিই শুধু ছিলো না, বরং তা ছিলো সেই জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতিক জীবনাদর্শের ভিত্তি। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এসবের মোকাবেলায় এক নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম তাওহীদের দিকে জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তিনি মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামী কবুল করার দাওয়াত পেশ করছিলেন।

মূর্তি, গাছ-পাথর, নদী-সাগর, চন্দ্র-সূর্য ও তারকামালাকে সর্বশক্তির কেন্দ্র কল্পনা করে যারা এসবের পূজা করতো, তাঁর দাওয়াতের আঘাত শুধুমাত্র তাদের ওপরই পড়ছিলো না, রাজবংশের একজন হওয়ার কারণে যারা নিজেদেরকে পূজ্য মনে করতো, সার্বভৌমত্বের অধিকারী মনে করতো, ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে সব ধরনের আইন-কানুনের উর্ধ্বে মনে করতো, দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা তথা সারা দেশের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার ওপরও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এই দাওয়াত প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানছিলো।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার অর্থ ছিলো, সমাজের তৃণমূল থেকে দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে যারা শির্ক ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো, তাদের গড়া সেই শির্কের প্রাসাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ও দেশকে নতুনভাবে সাজানো। শির্কে নিমজ্জিত এই জাতি ও তাদের শাসকদের সম্মুখে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন ঘোষণা

দিলেন, 'আমার মুখমন্ডলকে আমি ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' তখন সেই জাতি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলো, ইবরাহীম কি বলছে এবং তাঁর এই ঘোষণার অর্থ কি। এ জন্যই সেই জাতির ও জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের এলিট শ্রেণী ও জাতির শাসক শ্রেণী– সকলে একযোগে হযরত ইবরাহীমের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো।

একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার ও শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে মাত্র একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলো, তোমরা যাদেরকে সর্বশক্তির অধিকারী কল্পনা করে পূজা ও আরাধনার আসনে বসিয়েছো, আমি তাদেরকে মিথ্যা মনে করি। তোমরা যাদেরকে নিজেদের মাবুদ মনে করো, আমি তাদেরকে মাবুদ মনে করি না– বরং তারা সবাই আমার মাবুদ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি। তোমরা যাদেরকে আইন-কানুন প্রণেতা বলে পূজা করো এবং তাদের প্রণীত আইন-বিধান অনুসরণ করো, আমি তাদেরকে মানি না এবং তাদের প্রণীত বিধানের আনুগত্যও করি না। বরং আমার বিশ্বাস হলো, আইন-কানুন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ তিনিই এই বিশাল আকাশমন্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জগৎ ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এসব কিছুর তিনিই প্রতিপালক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। সুতরাং সৃষ্টি যার, আইন চলবে তাঁর এবং তিনিই কেবলমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী।

প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দেশের মধ্য থেকে মাত্র একটি কণ্ঠ এই ঘোষণা উচ্চারণ করলো, একটি মাত্র কণ্ঠের উচ্চারণে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের গদি থর থর করে কেঁপে উঠলো। অবশেষে সে দেশের সরকার প্রধান জুতা পেটা খেয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের একক কণ্ঠে যে ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিলো, সেই একই ঘোষণা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় ভাষায় বর্তমানে প্রতিদিন শত-কোটি কণ্ঠে নামাযের সূচনাতে উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তির মসনদে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে না। অযুত কণ্ঠে সেই একই উচ্চারণ শুনেও দ্বীনের দুশমনরা সামান্যতম বিচলিত হচ্ছে না। এর অর্থ হলো, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন এই ঘোষণা

দিয়েছিলেন, তখন সেই ঘোষণার মধ্যে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান ছিলো, বর্তমানে সেই ঘোষণা ঠিকই রয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে নেই কোনো প্রাণশক্তি। ফলে অযূত কণ্ঠের ঘোষণা বাতিল শক্তির মসনদে আঘাত হানতে সমর্থ হচ্ছে না।

নামাযের সূচনাতে বলা হচ্ছে, 'আমার মুখমন্ডলকে আমি ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' অর্থাৎ আমি পৃথিবীর কোনো নেতা-নেত্রীর, দার্শনিকের, বিজ্ঞানীর তথা চিন্তাবিদদের পেশকৃত আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, আদর্শ-পদ্ধতি বা মতবাদ-মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য করবো না, যেসব আইন-কানুন বা বিধান আমার কাছ থেকে আনুগত্য চায়, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র ঐ মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি নিজের আনুগত্যের মাথানত করে দিচ্ছি, যিনি ঐ বিশাল আকাশমন্ডলী ও যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক। যারা আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করে মানুষের বানানো বিধানের আনুগত্য করে, তারা মুশরিক এবং সেইসব মুশরিকদের সাথে নেই।

যারা নামায আদায় করেন, তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সূচনাতে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে ওয়াদা করছেন। কিন্তু এই ওয়াদা কতটুকু পালন করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে নামায আদায়কারীগণ কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সাক্ষী রেখে যে কথাগুলো একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেই কথাগুলো বাস্তব জীবনে কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে, এই হিসাব কি কখনো করা হচ্ছে?

নামাযের সূচনাতে বলা হলো, আমি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইবো না, কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী হিসাবে মানবো না, আল্লাহর আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানবো না এবং যারা মানে, তারা মুশরিক– আর আমি সেই মুশরিকদের দলের একজন নই। কিন্তু নামায শেষ করেই নামাযের সূচনাতে বলা কথাগুলোর বিপরীত কাজে নিজেকে জড়িত করা হচ্ছে। এর থেকে সুস্পষ্ট ওয়াদা খেলাফকারী মুনাফেকী আর কি হতে পারে?

নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে এমন লোক অনেক রয়েছে, যারা ইসলামের বিপরীত নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত এবং ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। বিপদে পড়লে পীরের দরবারে বা মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেয়। তারা বিশ্বাস করে, পীর সাহেব

অথবা মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তিনিই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর নামায আদায়কারী লোকগুলো মানুষের বানানো আইন-বিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য করছে এবং যারা সমাজ ও দেশে মানব রচিত আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বা টিকিয়ে রাখার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দিচ্ছে।

নামাযের সূচনাতে বলছে, আমি মুশরিকদের সাথে নেই। অথচ তারাই আপাদ-মস্তক শির্কের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করছে এবং শিরকভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সাহায্য সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং যারা নামায আদায় করছেন, তাদেরকে নামাযের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। নামাযে কি বলা হচ্ছে আর বাস্তব জীবনে কি করা হচ্ছে, এই হিসাব মিলিয়ে দেখতে হবে। নামাযে বলা কথার সাথে যদি বাস্তব জীবনের কোনো বৈপিরত্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তা দূর করে মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হতে হবে এবং গোলামী একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। নামাযে যা বলা হচ্ছে, তা বুঝে যদি বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা হয়, তখন সেই নামায আদায়কারী ব্যক্তির ঘোষণা বাতিল শক্তির মসনদে কম্পন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

নামাযে কি বলা হচ্ছে?

এরপর নামায শুরু করা হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ মহান তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কথাটি উচ্চারণ করে। আল্লাহু আকবার বা আল্লাহই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা– এই কথাটি মুসলমানদের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মুসলিম শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তার কানে শোনানো হয় আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবী থেকে একজন মুসলমান যখন বিদায় গ্রহণ করে অর্থাৎ যখন তার জানাযা আদায় করা হয়, তখনও বার বার উচ্চারণ করা হয় আল্লাহু আকবার।

অর্থাৎ মুসলিম জীবনের সূচনাও হয় আল্লাহু আকবার শব্দটি শোনার মধ্য দিয়ে এবং পৃথিবীর জীবনের শেষও হয় আল্লাহু আকবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীতে জীবিত থাকতে সে মুখে বার বার এই কথাটি উচ্চারণ করে।

নামায আদায়কালে নামায শুরুই করতে হয় আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চারণ করে এবং প্রত্যেক দিন ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কালে প্রায় দুই শতেরও অধিক বার এই শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়। অর্থাৎ মুসলিম জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতে হয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহু আকবার শব্দটি কেনো বার বার উচ্চারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে? এই শব্দ দুটোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি? আল্লাহু আকবার-কথাটি শুধুমাত্র দুটো শব্দের সমষ্টি না অসংখ্য শব্দের সমষ্টি? এই শব্দ দুটো উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কি অগণিত বাক্যাবলীর সমষ্টি বা সারমর্ম উচ্চারণ করা হয়? অথবা সেই অসংখ্য বাক্য একজন মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা কখনো সম্ভব নয় বিধায় সমস্ত কথার সমষ্টি এই দুটো মাত্র শব্দের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করার মাধ্যম হিসেবে আল্লাহু আকবার শব্দ দুটো মানুষকে উচ্চারণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে?

যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সবটুকু প্রশংসা কখনো কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয় বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন, তুমি বলো 'আল হাম্‌দুলিল্লাহ্' অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। কোনো মানুষকে যদি কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয় এবং সেই সাথে তাকে শতকোটি মুখ দেয়া হয়, শতকোটি মুখে সেই মানুষ যদি মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে তবুও আল্লাহ তা'য়ালার যতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য, তার শতকোটি ভাগের এক ভাগও আদায় করা সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে মহান আল্লাহর প্রশংসার হক আদায় করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ও অসম্ভব।

কারণ মহান আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক আর মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। সীমিত ক্ষমতা দিয়ে ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসার হক আদায় করা সম্ভব নয়। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁরই সৃষ্টির অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন। এ জন্যই তিনি তাঁর বান্দাকে একান্ত অনুগ্রহ করে শিখিয়েছেন, বান্দা! তোমার পক্ষে আমার প্রশংসার হক আদায় করা কখনো সম্ভব হবে না। এ জন্য তুমি শুধুমাত্র এই কথাটি উচ্চারণ করো, আল হাম্‌দুলিল্লাহ্।

একই বিষয় নিহিত রয়েছে আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মধ্যে। উচ্চারণ করা হচ্ছে, আল্লাহ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেনো আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ?

এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ লেখার চেষ্টা করে, তাহলে পৃথিবীর গোটা জীবনকালও যদি সেই ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তর লেখার কাজে ব্যয় করে, তবুও কি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের শতকোটি ভাগের একভাগও লিখে শেষ করতে সক্ষম হবে?

মানুষের ক্ষমতা সসীম এবং আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠত্বের হক আদায় করা কোনো মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না– এ কথা মহান আল্লাহ অবগত আছেন। এ জন্যই তিনি বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, তোমরা মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করে আমার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষনা দাও।

অসংখ্য অগণিত বাক্যাবলীর সারমর্ম ও সমষ্টি হলো আল্লাহু আকবার শব্দ দুটো। এই দুটো শব্দের মধ্য দিয়ে অগণিত বাক্য উচ্চারিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কে, তিনি কোন্ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁর ক্ষমতা কি ধরনের– অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে এই আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মাধ্যমে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও একক, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টির রব, মালিক, ইলাহ্, তিনি আহ্কামুল হাকিমীন ও আরহামুর রাহিমীন, তিনিই যাবতীয় সম্মান মর্যাদার অধিকারী। যাবতীয় প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই জন্য এবং হাম্দ ও তাস্বীহ শুধুমাত্র তাঁরই জন্য হওয়া উচিত, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই তাস্বীহ্ করছে, তিনি উত্তম নামের অধিকারী, তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি তওবা কবুলকারী, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, তিনি যাবতীয় কিছু শ্রবণকারী, তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী, তিনি কঠোর শাস্তিদানকারী, তিনিই আকার-আকৃতি রচনাকারী, তিনি প্রশস্ততা বিধানকারী, তিনি অপরিসীম বরকতশালী, তিনি উত্তম প্রতিফল দানকারী, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে পবিত্র, তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছু তাঁর সম্মুখে সিজ্দাবনত।

তাঁর থেকে বড় ওয়াদা পূরণকারী আর কেউ নেই, তিনি অঙ্গীকারের বিপরীত কাজ করেন না, তিনিই সহায় ও আশ্রয়, তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী এবং সর্বোত্তম রক্ষক, তিনি দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী, তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী, তাঁর থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই, আস্থা স্থাপনের জন্য তিনিই যথেষ্ট, তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি তাঁরই হাতে, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই, কেউ তাঁর অংশীদার হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, তিনিই দাসত্ব-ইবাদাত লাভের অধিকারী, তিনিই বিশ্বলোকের সবকিছুর পথনির্দেশ দানকারী এবং সঠিক পথ প্রদর্শনকারী, প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর রহমত পরিব্যাপ্ত, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য, তাঁর কাছেই

প্রত্যেককে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশমান এবং তিনি প্রচ্ছন্ন, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনিই প্রাণ দানকারী, তিনিই নিষ্প্রাণকে জীবন দান করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্ববধানকারী, তিনিই সব জিনিসের ভান্ডারের মালিক, তিনিই সব জিনিসের তকদীর নির্ধারণকারী, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র তাঁরই আয়ত্বে, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না।

কোনো কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, তাঁর সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয়, তিনি মুখাপেক্ষিহীন, মানুষ তাকে স্রষ্টা মানলে তবেই তিনি স্রষ্টা হবেন- এ প্রয়োজন তাঁর নেই, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোনো কিছু নেই, তাঁর সকল ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর একটি আদেশের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়, তাঁর পরিকল্পনায় কোনো ব্যর্থতা নেই, তিনি যার সাথে রয়েছেন, কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে না, তাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই, বিজয় ও সফলতা তাঁর অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেই থাকেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো নি'মাত লাভ করতে পারে না, তিনি মানুষের অবোধগম্য পন্থায় নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন, তিনি যাকে চান তাঁর যমীনের উত্তরাধিকারী বানান, তিনি যাকে চান নিজের রহমত দানে ধন্য করেন, আনন্দ-বেদনা তাঁরই করায়ত্বে, যে বান্দাকে তিনি চান আপন অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করেন, যাকে চান উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তিনি যাকে লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্থ করতে চান, তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, কল্যাণ কোন্ জিনিসে আর কোন্ জিনিসে নয়। সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তাঁর ফয়সালা অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে ভুল ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই, তাঁর পক্ষে সকল মানুষকে সৃষ্টি এবং পুনরায় জীবিত করে উঠানো কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নয়।

এ ধরনের যাবতীয় অসংখ্য বাক্যাবলী আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কথা উচ্চারণকারীকে অনুধাবন করতে হবে, সে মুখে কোন্ কথা উচ্চারণ করছে। উচ্চারণকারী যদি জেনে বুঝে এই কথা উচ্চারণ করে, তাহলে তার ওপর উচ্চারিত কথার প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন দেশের কোনো নাগরিককে যদি প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে ধমকের সুরে বলে, 'তুমি যদি তোমার

নীতি পরিবর্তন না করো, তাহলে তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেব।' প্রধানমন্ত্রীর বলা এই কথাটি উক্ত ব্যক্তির সমগ্র সত্তার ওপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চারণকারী ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে তা উচ্চারণ করে, তাহলে তার ওপর এই শব্দ এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যে, সেই ব্যক্তির জীবনধারা আমূল পরিবর্তন হতে বাধ্য।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই সমস্ত কিছুর মালিক, এই অনুভূতি জাগ্রত রেখে উচ্চারণ করতে হবে– আল্লাহু আকবার। শুধু মুখেই উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকা যাবে না, তাঁর বিধানকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি তাঁর বিধানও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এর মোকাবেলায় অন্য কোনো বিধান অনুসরণের যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর বিধানকেই সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চে স্থান দিতে হবে।

আল্লাহু আকবর– বলে নামাযে দাঁড়ানোর অর্থই হলো, আল্লাহ তা'য়ালা এবং মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত এই পৃথিবীতে যত মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান যেখানে যা কিছু রয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ ও মা'বুদের দাবীদার যে যেখানে আছে, সবই আমার পায়ের নীচে। আল্লাহ তা'য়ালাই আমার একমাত্র মা'বুদ ও ইলাহ এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধানই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ–

গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জ্ঞাত। তিনি মহান, সর্বাবস্থায় তিনি সর্বোচ্চে অবস্থান করেন। (সূরা আর রা'দ-৯)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ–

আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আল হজ্জ-৬২)

বর্তমানে মুসলিম পরিচয় দানকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। আবার যারা নামায আদায় কবেন, তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তিই জানেন না, নামাযে তারা কি বলছেম এবং জানার চেষ্টাও করেন না।

নামাযের সূচনাতে বলা হচ্ছে আল্লাহু আকবার অর্থাৎ আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বোচ্চে তথা তাঁর দেয়া জীবন বিধান, আইন কানুনই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বিধানের মোকাবেলায় অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান একেবারেই নগণ্য, তুচ্ছ বা অকল্যাণকর। কিন্তু নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মৌখিক ও বাস্তব কার্যাবলীর মাধ্যমে এ কথারই সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বা তাঁর বিধান শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চে নয়– বরং মানুষের বানানো আইন-কানুন বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চে।

একশ্রেণীর নামাযী লোক, নামায আদায় করছেন– কিন্তু এমন মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেন, যে মতবাদ-মতাদর্শ ইসলামকে বরদাস্ত করতে মোটেও রাজী নয়। অর্থাৎ এসব নামাযী লোক শুধুমাত্র মুখেই উচ্চারণ করছে আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তারা এ কথারই সাক্ষী দিচ্ছে যে, মসজিদ বা নামাযের স্থানেই আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার সমাজ, দেশ তথা রাজনীতি, অর্থনীতি তথা দেশের সামগ্রিক আইন-কানুন ও বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ নন– মানুষের বানানো বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর লোক– যারা নামাযের আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করছে না, তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ-الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ-

ধ্বংস সেই মুসল্লীদের জন্য, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়, যারা প্রদর্শনীমূলক কাজ করে। (সূরা আল মাউন-৪-৫)

এই শ্রেণীর লোক ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত এবং ঈমানের দাবীর ব্যাপারে এরা মিথ্যাবাদী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ امَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-

এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (সূরা আল বাকারা-৮)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এমন দুটো বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যে দুটো বিষয়ই অদৃশ্য। এই আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, এরা বলে– আমরা কোরআন ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। বরং বলা হয়েছে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি।

মুনাফিকরা সাধারণত প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের কথার ধরনও হয় কৌশলপূর্ণ। তারা যদি কোরআন ও রাসূলকে অস্বীকৃতি জানাতো, তাহলে তারা নিজেদেরকে মুসলিম সম্প্রদায় ভূক্ত বলে দাবী করার কোনো সুযোগ পেত না। কারণ, কোরআন ও রাসূল ছিলেন দৃশ্যমান। এই দুটো জিনিসের প্রতি তাদের অন্তরে অবিশ্বাস থাকলেও মুখে তারা স্বীকৃতি দিয়েছিলো যে, আমরা কোরআন ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। এ জন্য স্বয়ং রাসূল ও কোরআনের পক্ষে তাদের কাছে প্রশ্ন তোলার সুযোগ ছিলো না যে, তোমরা আমাদের প্রতি বিশ্বাসী নও। এজন্য তারা এমন দুটো বিষয়ের প্রতি নিজেদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, যে দুটো বিষয়ের একটিও দৃশ্যমান নয় এবং এ দুটোর একটিও এই পৃথিবীতে তাদেরকে প্রশ্ন করবে না। অর্থাৎ তারা দাবী করে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হয়ে এ কথা বলবেন না যে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা বিশ্বাসী নও। পরকালের বিষয়টিও অনুরূপ।

এ কারণেই তারা অদৃশ্য দুটো বিষয়ের প্রতি নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করে, লোক দেখানো নামায আদায় করে, সেই সাথে বাস্তবে এমন কর্ম করে থাকে– যে কাজের মাধ্যমে তারা এ কথাই প্রমাণ করে, নামাযে তারা যা বলছে, সেই বলা কথার প্রতি তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা ঈমানদারদের সাথে ধোকাবাজী করে থাকে। নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে তারা মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্বের আসন দখল করে, ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিরোধী কাজ করে।

নামাযে সূরা ও অন্যান্য দোয়া-কালামে কি বলা হচ্ছে?

নামাযে দাঁড়ানো হলো মুখে আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ– এ কথা মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু নামাযে কিভাবে দন্ডায়মান হতে হবে, এ সময় দেহ ও মনের অবস্থা কেমন হবে? এই প্রশ্নের জবাবও সেই আল্লাহ তা'য়ালাই দিয়েছেন, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি নামায বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ–

নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হিফাজত করো। বিশেষত এমন নামায যা নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্যের সমন্বয়। আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত ভৃত্য দন্ডায়মান হয়ে থাকে। (সূরা আল বাকারা-২৩৮)

মুখে উচ্চারণ করা হলো, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ কথাটি যদি কেউ বুঝে উচ্চারণ করে, তাহলে নামাযে দন্ডায়মান হওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই তার বুকের ভেতর থরথর করে কাঁপতে থাকবে যে, সে কোন্ সত্ত্বার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। আর এই কম্পনই বাহ্যিকভাবে তার গোটা দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। প্রবল প্রতাবশালী শাসকের সম্মুখে সাধারণ প্রজা যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়াচড়া করে এবং কম্পিত কণ্ঠে কথা বলে, অনুরূপ হবে নামাযীর অবস্থা। যে আল্লাহর সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছে, সেই আল্লাহর অসীম রহমতেই সে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছে, সেই আল্লাহর রহমত তাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তিনিই তাকে প্রতিপালন করছেন। এসব বিষয় নামাযীর স্মরণে থাকলে, সেই নামাযীর নামাযে দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজ্দা দেয়া ও বসার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাবে পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আর এই ধরনের নামাযই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন এবং কবুল করবেন।

তাকবীরে তাহ্রীমা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলো সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেলো। অর্থাৎ নামাযের বাইরে আল্লাহ তা'য়ালা যেসব কাজ তাঁর বান্দার জন্য হালাল করেছেন, সেই কাজগুলোই নামায আদায়রত অবস্থায় বান্দার জন্য হারাম করেছেন। সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করার সাথে সাথেই আবার নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলো হালাল হয়ে যায়। এরপর নামাযীকে প্রথমেই ছানা পাঠ করতে হয়। ছানা অর্থ হলো, মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ বর্ণনা করা। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহ্রীমা বলার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি আল্লাহর রাসূলকে বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরআন হোক। আপনি তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝখানে নীরব থাকেন কেনো? তখন আপনি কি পাঠ করেন তা আমাকে বলুন। আল্লাহর রাসূল বললেন, আমি পাঠ করি–

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ-اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ-

হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গোনাহ্সমূহ থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকে শুভ্র বস্ত্র পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ্সমূহ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দিন। (আবু দাউদ)

হাদীসে এ ধরনের অনেক দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ক্বিরাআতের পূর্বে পাঠ করতেন। যেমন–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-اِنَّ صَلَاتِىْ-وَنُسُكِىْ-وَمَحْيَاىَ-وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-لَاشَرِيْكَ لَه وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ-اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ-ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَايَغْفِرُ

الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-وَاهْدِنِىْ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَيَهْدِىْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ-وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا، لاَيَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ-وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ-أَنَا بِكَ وَإِنَّكَ وَإِلَيْكَ-تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি সেই বাদশাহ যিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার গোনাহের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার সমূদয় গোনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারেনা। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো, তুমি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারেনা, আমার দোষসমূহ তুমি আমার ভেতর থেকে দূরীভূত করো, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ চারিত্রিক-দোষ অপসারিত করতে পারে না।

প্রভু হে! আমি তোমার আদেশ মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হস্তে নিহিত। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ মন্দ তোমার কাম্য নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি। (মুসলিম)

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ-وَمِيْكَائِيْلَ-وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ-عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত, তুমিই তার উত্তম ফয়সালা করে দাও। যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে পথ প্রদর্শন করো। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করে থাকো।

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا–اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا–اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا–وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً–

তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ –مِنْ نَفْخِهِ–وَنَفْثِهِ، وَهَمْزِ–

আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'য়ালা, সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ তা'য়ালা সকালে ও সন্ধ্যায়, দিনে ও রাতে তথা সর্বক্ষণ পাক-পবিত্র (তিনবার)। অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আশ্রয় কামনা করছি তার দম্ভ হতে, তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা হতে। (আবু দাউদ)

আবু দাউদ হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে অর্থাৎ ক্বিরাআতের পূর্বে বলতেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤاِلٰهَ غَيْرُكَ–

তুমি পবিত্র, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হে আল্লাহ! তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত, তুমি বরকত দানকারী এবং মহান, তোমার নাম ও মর্যাদা সর্বোচ্চে। তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই।

এই দোয়ার বাক্যগুলো ছোট হওয়ার কারণে এই দোয়াটিই সাধারণত অধিকাংশ লোকজন পাঠ করে থাকে। এই দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে লক্ষ্য করে নামায আদায়কারী বলছে, তুমি পবিত্র এবং যে কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ থেকে তুমি মুক্ত। একমাত্র তুমিই প্রশংসা লাভের অধিকারী। শুধুমাত্র তুমিই পারো বরকত দিতে এবং তোমারই নামই সর্বোচ্চে। তুমি ব্যতীত ইবাদাত, বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা লাভের অধিকারী কেউ নয়। তুমি ব্যতীত আইন-কানুন ও বিধান দানকারী আর কেউ নেই।

নামাযে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো আল্লাহর সম্মুখে উচ্চারণ করা হলো, আর নামায শেষ করেই প্রশংসা করা হচ্ছে অন্যের। বরকতের জন্য ধর্ণা দেয়া হচ্ছে মৃত মানুষের

কবরে বা পীরের দরবারে। আইন-কানুন মেনে নেয়া হচ্ছে পৃথিবীর দার্শনিক বা চিন্তাবিদদের। এরপর তা'উজ ও তাসমিয়া পাঠ করেই সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযই হয় না।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে নিজের জন্য যতটুকু সহজ ততটুকু আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে। নামাযে কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা ফরজ। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ–وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ–

কোরআন থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করো। আর নামায প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা মুয্যাম্মিল-২০)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পাঠ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ)

নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পরেই কোরআন থেকে পাঠ করার পরই রুকু সিজ্দায় যেতে হবে। তবে ব্যতিক্রম হলো, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার ফরজ নামাযে। এসব নামাযের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহার পরে কোরআন থেকে পাঠ করতে হবে এবং শেষের দুই বা এক রাকাআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকু সিজ্দায় যেতে হবে। বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায আদায় করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিধার কারণে মানুষ সাধারণত কোরআনের ত্রিশ পারার ছোট ছোট সূরাসমূহ নামাযে পাঠ করে।

এসব সূরায় কি বলা হয়েছে, তা নামায আদায়কারীকে কোরআনের তাফসীর থেকে জেনে নিতে হবে। যেসব সূরা নামাযে পাঠ করা হয়, তার অর্থ ও তাফসীর জানা থাকলে তা পাঠ করার সময় নিজের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং নামায সুন্দর হবে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা সুন্দর নামাযই কবুল করবেন এবং বিনিময় দিবেন। সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করেই রুকু সিজ্দায় যথাযথভাবে যেতে হবে এবং রুকুর তাস্বীহ পাঠ করতে হবে–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ–

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ মুক্ত।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলতেন–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ–

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ মুক্ত ও সপ্রশংসিত।

একথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণে সহীহভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে সমস্ত অন্তর দিয়ে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এ কথাগুলো ন্যূনতম তিনবার উচ্চারণ করতে হবে। এরপর রুকু থেকে সোজা হওয়ার সময় বলতে হবে–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ–

আল্লাহ তা'য়ালা তার কথা শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

এরপর সোজা দাঁড়িয়ে বলতে হবে–

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ–

হে আমাদের রব্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই।

নামাযের জামাআত হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করাচ্ছেন। তিনি যখন রুকু থেকে ওঠার সময় বললেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ–

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায়কারী একজন সাহাবী উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন–

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ–

হে আমাদের রব্! তোমার জন্যই প্রশংসা, সর্বাধিক পবিত্র ও মোবারক প্রশংসা।

নামায শেষ করে নবীজী পিছন ফিরে জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে এভাবে বললো? একজন সাহাবী জানালেন, তিনি এ কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তেত্রিশেরও অধিক ফেরেশ্‌তাকে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি, কে সর্বাগ্রে এই কথাগুলো লিখবে। (বোখারী, আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু সিজ্‌দায় এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে বিভিন্ন ধরনের দোয়া পড়তেন, যা নামায বিষয়ক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সিজ্‌দায় যেতে হবে। সিজ্‌দায় এমনভাবে যেতে হবে যে, নিজের সমগ্র সত্বাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতী পায়ের ওপরে সোপর্দ করতে

হবে। নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতি পদপ্রান্তে। মনের মধ্যে এ কথা জাগ্রত রাখতে হবে যে, আমি আমার মাথা আমার মহান রব্-এর পায়ের ওপর রাখলাম। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, বান্দাহ্ যখন আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা দেয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা ও সেই বান্দার মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো এবং সিজ্‌দা করো আর তোমাদের রব্-এর দাসত্ব করো। (সূরা হজ্জ-৭৭)

সিজ্‌দার সময় বান্দা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছে যায়। এরপর সিজ্‌দার তাসবীহ্ পাঠ করতে হয়–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى–

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ পবিত্র।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলতেন–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى وَبِحَمْدِهٖ–

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ মুক্ত ও সপ্রশংসিত।

নামাযে সিজ্‌দার মাধ্যমে এ কথারই স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে যে, হে আল্লাহ! তোমার সম্মুখে মাথানত করে দিলাম, তুমি যে বিধান অবতীর্ণ করেছো, সেই বিধানের সম্মুখেও মাথানত করে ঘোষণা করছি, তুমি যেমন মহান, পূত-পবিত্র তেমনি তোমার বিধানও পূত-পবিত্র ও কল্যাণকর। একমাত্র তোমার বিধানের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই রয়েছে সর্বাঙ্গিন মঙ্গল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং সিজ্‌দায় বিভিন্ন ধরনের দোয়া করেছেন। এসব দোয়া হাদীসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। সিজ্‌দায় গিয়ে যেসব দোয়া করা হয়, তা কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে। এক সিজ্‌দা দিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতে হবে, তাড়াহুড়া করে দ্বিতীয় সিজ্‌দা দেয়া যাবে না। এক সিজ্‌দা দিয়ে সোজা হয়ে বসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধরনের দোয়া পাঠ করেছেন। এর মধ্যে একটি দোয়া হলো–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ-

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার রহম করো, আমাকে বলবান করো, আমার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমাকে জীবিকা দান করো। (আবু দাউদ)

এভাবে দুই রাকাআত, তিন রাকাআত বা চার রাকাআত নামায আদায় করতে হবে, হাদীসে যেসব তাশাহুদ ও দরুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাঠ করে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে। ফজর থেকে শুরু করে ইশার নামায শেষে বিতরের নামায আদায় করতে হবে। যারা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন, তারা এই নামায শেষে বিতিরের নামায আদায় করবেন। বিতিরের নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ করতে হয়। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে নামাযে কুনূত পড়ার জন্য শিখিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّه لاَيَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَيَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ-

হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছো, আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। যাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা ও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যা কিছু প্রদান করেছো, আমার জন্য তাতে বরকত দান করো। তোমার মন্দ ফয়সালা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই প্রকৃত ফায়সালাকারী আর তোমার ওপর কোনো ফায়সালাকারী নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে সম্মান দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমারে রব্, অসীম প্রাচূর্যশীল তুমি, অতিশয় মহান।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম উল্লেখিত দোয়া কুনূতটিই সর্বোত্তম বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে নিম্নের কুনুতটিও উত্তম বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমারই প্রতি ঈমান পোষণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি এবং সর্বপ্রকার মহোত্তম গুণাবলী তোমারই প্রতি আরোপ করি। আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করি, তোমার অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করি না। আমরা তোমার অবাধ্য লোকদের ত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখিনা। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামায আদায় করি এবং তোমাকেই সিজ্‌দা করি। আমরা তোমারই পথে অগ্রসর হই, তোমারই পথে এগিয়ে চলি। তোমার রহমতের আমরা আকাঙ্খী, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি আর তোমার আযাব শুধুমাত্র কাফিরদের জন্যেই।

দোয়া কুনুতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে, একমাত্র তোমাকে ব্যতীত আর কারো ওপর আমরা ভরসা করি না, সর্বাবস্থায় আমরা তোমারই প্রতি ভরসা করি। আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করছি, কখনো আমরা অকৃতজ্ঞতার পথে অগ্রসর হই না। যারা তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ, তোমার বিধান মানে না, তোমার বিধানের সাথে বিরোধিতা করে, তোমার দেয়া জীবন বিধান ত্যাগ করে অন্য কোনো বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে, আমরা তাদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখি না।

এ ধরনের নানা কথা মহান আল্লাহর সম্মুখে বলা হয়। নামায শেষ করেই ঐ সবলোকদের সাথেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা হয়, তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়, তাদেরকেই সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়, যারা ইসলামের পরিবর্তে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে যারা নামাযে বলা কথাগুলোর সাথে নিজেরাই বাস্তব কর্মের

মাধ্যমে স্ববিরোধিতা করে থাকে, তাদের নামায অবশ্যই মহান আল্লাহ্ কবুল করবেন না এবং এই নামায কোনোক্রমেই ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে বিরত রাখবে না। আখিরাতের ময়দানে এসব নামাযীর দিকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা দৃষ্টি দিবেন না এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদেরকে নিজের উম্মত হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন না।

আরবী ইবাদাত শব্দের ভুল অর্থ গ্রহণ করার কারণেই একশ্রেণীর নামাযীর বাস্তব জীবনধারায় বৈপরিত্য দেখা যায়। ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো–তারা মনে করেছে, নামায-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যারা পড়ে তারা নামাযের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামায আদায়ের নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে শয়তানের গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ূ লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর শয়তানের গোলামী করলো।

একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে শয়তানের গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি

রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর শয়তানের গোলামী করবে?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামায-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়। এই নামায-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না।

সৈনিক জীবনে যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামায-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামায-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের কর্মকান্ডকে ইবাদাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল, এসব দিক বুঝতে হবে। ইবাদাত সম্পর্কে যদি ধারণা অর্জন করা না যায়, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় দেয়াই বৃথা। কারণ মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য, আল্লাহর গোলামী করার জন্য।

নামাযে কী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের ওপর। নেতৃত্ব দিতে হলে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হয়। নেতৃত্বের মৌলিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম না হলে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নামায মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা নেতৃত্ব দিবেন, তাদের প্রথম কাজ হলো, নিজেরা যাবতীয় সৎ গুণাবলীর অধিকারী হবেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের সর্বপ্রথম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করা। নামায মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভয় সৃষ্টি করে দেয়।

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, নামায আদায়ের পূর্ব শর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। একজন মানুষ যখন নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বা নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, তখন কেউ তাকে এ প্রশ্ন করে না যে, আপনার শরীর ও পোষাক পবিত্র কিনা বা আপনি অযু করেছেন কিনা।

কারণ যিনি নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়েছেন, তিনি শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করেছেন, পবিত্র বস্ত্র পরিধান করেছেন এবং অযু করেই মসজিদে প্রবেশ করেছেন। অপবিত্র শরীর ও বস্ত্রে বা অযু ব্যতীতই একজন মানুষ মসজিদে নামাযে দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে না। তবুও কেনো সে পবিত্রতা অর্জন করলো? কারণ এ কথা তার মনে সক্রিয় রয়েছে যে, অপবিত্র অবস্থায় বা অযু ব্যতীত নামায আদায় করলে সে নামায আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করবেন না এবং আদালতে আখিরাতে তাকে গ্রেফতার করা হবে। এই ভয় তার মধ্যে জাগ্রত ছিলো বলেই সে পবিত্রতা অর্জন করেছে। এভাবে নামায মানুষের মনে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

যারা একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করে, তারা যে কোনো অবস্থায়ই থাক না কেনো– জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা নামায ত্যাগ করেন না। তাদের জীবনে এমন অবস্থা হয় না যে, নির্জনে তারা একাকী রয়েছেন, এখন নামায আদায় না করলে কোনো মানুষ দেখবে না। কিন্তু এরপরও তারা একমাত্র মহান আল্লাহর ভয়ে নামায আদায় করে

থাকেন। নামাযে দাঁড়িয়ে নীরবে কে কোন্ সূরা পাঠ করছে, নামায শেষে এ জন্য তাকে কারো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। কেউ ইচ্ছে করলে নামাযে সূরা বা অন্যান্য তসবীহ্ পাঠ না করে অন্য কিছুও পাঠ করতে পারে।

কিন্তু কেউ না শুনলেও মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুই শুনছেন, এই ভয় মনে জাগরূক থাকার কারণে নামাযে যেখানে যা পাঠ করতে হবে, মানুষ তাই পাঠ করে। এভাবে নামায মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা সৃষ্টি করে যে, নির্জনে একাকী অবস্থায় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যে কাজ করা হবে, তা মহান আল্লাহ্ দেখবেন এবং এই কাজের হিসাব আল্লাহর দরবারে তাকে দিতে হবে। এভাবেই নামায মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান মানুষে পরিণত করে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। একটি বিষয়ে এভাবে বার বার তাগিদ দেয়ার একমাত্র কারণই হলো, যার মনে মহান আল্লাহর ভয় জাগরূক থাকে, সে ব্যক্তির পক্ষে কোনোক্রমেই অসৎ কোনো কাজে নিজেকে জড়িত করা সম্ভব নয়। তার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, দায়িত্বে অবহেলা করা বা দেশ ও জাতির ক্ষতি হয় এমন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর ভয় মুসলমানদের মধ্যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে জাগরূক রাখার লক্ষ্যেই তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দেয়া হয়েছে। মুসলমান নামায আদায়ের মাধমে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে জীবন পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আল্লাহকে ভয় করার দুর্লভ গুণ মুসলমান যেন আয়ত্ব করতে পারে, এর জন্য যেমন নামায ফরজ করা হয়েছে, তেমনি পবিত্র কোরআনে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো যতটা ভয় তাঁকে করা উচিত। (সূরা ইমরান-১০২)

সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মুসলমান যেন মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণে রাখে, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে। পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাঁর পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে, সেই আল্লাহ তা'য়ালাকে মুসলমান প্রত্যেক কাজে যেন স্মরণে রাখে, এই প্রশিক্ষণ নামাযের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। মুসলমানের চব্বিশ ঘন্টার জীবন নামায দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ নামায যেমন মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে নামাযের বাইরের জীবনও যেন তাঁকে স্মরণে রেখে তাঁরই আদেশ অনুসারে পরিচালিত করা হয়, তার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে নামাযের মাধ্যমে। প্রত্যেক দিন এই প্রশিক্ষণ শুরু হয় দিনের যখন সূচনা হয় তখন থেকেই আর শেষ হয় দিনের শেষে রাতের প্রথম প্রহরে। অর্থাৎ ফজরের নামায দিয়ে শুরু এবং এশার নামাযে এই প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

সারা দিনের মধ্যে আরো তিনবার অর্থাৎ যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাযে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফজরের নামাযে মুসলমানকে প্রথম প্রশিক্ষণ দেয়া হলো, তোমাকে এই পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছে। তুমি নিজেকে আল্লাহর বিধানের অধীনে পরিচালিত করবে এবং এই বিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সংগ্রাম করবে। তুমি মুক্ত-স্বাধীন নও, তোমার সকল কাজের হিসাব ঐ আল্লাহর দরবারে দিতে হবে, যে আল্লাহকে তুমি দিনের সূচনায় সমস্ত কাজের পূর্বে প্রথমে সিজ্‌দা দিলে। পৃথিবীর অন্যান্য কাজ শুরু করার পূর্বে তুমি সর্বপ্রথমে তোমার যে রব্‌-কে সিজ্‌দা দিলে, সেই রব্‌-এর আদেশ অনুসারেই তুমি সারা দিন পৃথিবীর অন্যান্য কাজ-কর্ম করবে।

ফজরের নামাযের পরে একজন মুসলমান জাগতিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। এসব কাজের মধ্যে সে নিজেকে যেন বিলীন করে না দেয় এবং নিজেকে যেন স্বাধীন সত্তা বলে বিবেচনা না করে, এই কথাটি তাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই যোহরের নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্ম স্থগিত রেখে যোহরের সময় পুনরায় তাকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ ফজরের নামাযে তাকে যে চেতনার প্রশিক্ষণ দেয়া হলো, দুনিয়ার ঝামেলায় নিমজ্জিত হয়ে সেই চেতনা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। চেতনা অনেকাংশে ঝিমিয়ে পড়ে। এই চেতনাকে পুনরায় যোহরের সময় শাণিত করা হয়। ফজরের সময় যে প্রশিক্ষণ দিয়ে দুনিয়ার দুর্গম স্থানে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, যোহর, আসর ও মাগরিবের সময় সেই চেতনাকে শাণিত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সবশেষে সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ যখন সে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করতে যাবে, তখনও তাকে সেই একই চেতনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়।

নামায এভাবেই মুসলমানের চব্বিশ ঘন্টার জীবনে মহান আল্লাহর স্মরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ-

আমাকে স্মরণে রাখার জন্য নামায প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা ত্ব-হা-১৪)

পৃথিবীর নেতৃত্বের দায়িত্ব যাদের প্রতি অর্পণ করা হলো, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নামায বাধ্যতামূলক করে দিয়ে তাঁকে প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা এ জন্যই করেছেন যে, তারা কোনো কাজই যেন নিজের মর্জ্জি মতো না করে। প্রত্যেক কাজেই যেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে। রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় অসন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে গিয়ে অর্থাৎ নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সে যেন সীমালংঘন না করে, এ জন্যই নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণে রাখার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নামায সাংগঠনিক জীবনের বাস্তব প্রশিক্ষণ

নামায মুসলমানদের মধ্যে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ কথা অনস্বীকার্য যে– ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী না হলে পৃথিবীতে কোনো জাতি সুখী-সমৃদ্ধশালী ও উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না এবং নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারও করতে পারে না। ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে পৃথিবীর বহু শক্তিশালী জাতি পরাধীনতার অভিশাপে গোলামীর জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের মধ্যে যখন ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ছিলো, তখন সারা দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন ছিলো তাদের পদতলে।

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতির অস্তিত্ব ছিলো না যে, তারা মুসলমানদের দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে বা তাদের প্রতি নির্দেশের স্বরে কথা বলে। কিন্তু সেই মুসলমানই বর্তমানে রয়েছে বরং অতীতের তুলনায় বর্তমানে তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। তবুও তারা গোলামী, লাঞ্ছনা আর অবমাননাকর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। সারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির কাছে কুকুরের মতো প্রাণীর যে মূল্য রয়েছে, মুসলমানদের সেই মূল্য নেই। পাশ্চাত্য দুনিয়া স্বদম্ভে ঘোষণা করছে, পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের জন্য যে মানবাধিকার প্রযোজ্য, তা মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব কতটা নির্মম পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ হলো বর্তমানের মুসলিম দুনিয়া। সারা দুনিয়া ব্যাপী তারা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদেরকে বন্য প্রাণীর মতো নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলিম নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, একটির পর একটি মুসলিম দেশ অমুসলিম শক্তি দখল করে নিচ্ছে, মসজিদসমূহ অস্ত্রের আঘাতে ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হচ্ছে, পবিত্র কোরআন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, অসহায় মুসলিম নারী, শিশু, তরুণ-যুবক ও বৃদ্ধদের ধরে কারাবদ্ধ করে কারাগারে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হচ্ছে, কিন্তু প্রায় দেড় শত কোটি মুসলমান নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সামান্য মৌখিক প্রতিবাদও করছে না।

এর একমাত্র কারণ হলো, তাদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই। ঐক্য ও সংহতি মুসলমানদের মধ্যে থেকে বিদায় নিয়েছে। নামাযের অন্যতম শিক্ষা হলো ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যারা নামায আদায় করেন, তারা নামায থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেন না।

মুসলিম উম্মাহ্ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিবে, এ জন্য নামাযের মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন, মুসলিম উম্মাহ্ নামায থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এই নামাযই মুসলমানদেরকে একমুখি হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানে যে অবস্থায় মুসলমান বাস করুক না কেনো, তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন নিজেদের চেহারা মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বাঘরের প্রতি স্থির করে নামায আদায় করে। মহাসাগরের মাঝখানে জলযানে অথবা মহাশূন্যে যন্ত্রযানে কোনো মুসলমান একাকী অবস্থায় যখন অবস্থান করবে, তখন নামাযের সময় উপস্থিত হলে, তাকে অবশ্যই নিজের চেহারা বায়তুল্লাহর প্রতি স্থির করে নামায আদায় করতে হবে। মুসলমান যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ কোন্ দিকে তা নির্ণয়ে যদি সে ব্যর্থ হয়, তাহলে বায়তুল্লাহর অবস্থান মন যে দিকে সাক্ষ্য দিবে সেদিকেই চেহারা স্থির করে নামায আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ–

মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তুমি যেখানেই থাকো না কেনো, এর দিকেই মুখ করে তুমি নামায আদায় করতে থাকবে। (সূরা বাকারা-১৪৪)

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন বায়তুল্লাহ শরীফ পুনঃনির্মাণ করলেন, তখন মক্কা নগরী সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বিশেষ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ১২৫ আয়াতে বলেছেন–

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا–وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى–

আর এ কথাও স্মরণ করো, আমি এই কা'বাঘরকে মানুষের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং লোকদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে নামাযের জন্য দাঁড়ায়, সেই স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।

মুসলমানদের নানা ধরনের পথ, মত ও নানা কেন্দ্রের অনুসারী হওয়ার সুযোগ নেই। মুসলমানদের একমাত্র কেন্দ্র হলো কা'বাঘর এবং এই ঘরকে কেন্দ্র করেই মুসলিম মিল্লাত নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। নামায যেমন একমাত্র কা'বাঘরের দিকে মুখ করে আদায় করতে হবে, তেমনি সারা দুনিয়ার মুসলমান নিজেদেরকে একদেহের ন্যায় মনে করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিতে এমনই দেখতে পাবে, যেমন একটি দেহ। যদি তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয় তো তার সাথে গোটা দেহ জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। (বোখারী, মুসলিম)

আরেক বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমাজে একজন মুমিনের অবস্থান হচ্ছে গোটা দেহে মস্তকের সমতুল্য। মাথায় ব্যথা হলে যেমন গোটা দেহ কষ্টানুভব করে, তেমনি একজন মুমিনের কষ্টে সমস্ত মুমিনই কষ্টানুভব করতে থাকে।

সাম্য, মৈত্রী, একতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী বাহক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্যে ইমারতের মতো হওয়া উচিত এবং তাদের একে অপরের জন্যে এমনই দৃঢ়তা ও শক্তির উৎস হওয়া উচিত, যেমন ইমারতের একটি ইট অপর ইটের জন্যে হয়ে থাকে। এরপর তিনি হাতের আঙ্গুলিসমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে স্থাপন করলেন। (বোখারী-মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মিল্লাতকে একটি ইমারতের অনুরূপ হতে বলেছেন। সারা পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটি ইমারতে পরিণত করার লক্ষ্যে নামায তাদেরকে কা'বা কেন্দ্রিক করে দেয়। সমস্ত মুসলমান যেমন কা'বাঘরের দিকে নিজের চেহারা স্থির করে নামায আদায় করবে, তেমনি তারা যে কোনো সমস্যার মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হয়ে সমস্যার সমাধান করবে।

যে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তারা কা'বাঘরের দিকে নিজের চেহারা স্থির করছে, সেই আল্লাহর বিধান অনুসারেই তারা সামগ্রিকভাবে নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে। প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

এভাবে একটি এলাকার লোকজন যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে আদায় করার জন্য মসজিদে আসে, তখন এলাকার অন্যান্য লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের সুযোগ হয়। এলাকার একজনকে মসজিদে অনুপস্থিত দেখলে তার অনুপস্থিতির কারণ জানার জন্য স্বাভাবিক উৎসুক্য অন্যের মনে সৃষ্টি হয়।

জামাআতে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ধনী-গরীব, সাদা-কালো বা শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য করার অবকাশ নেই। যিনি মসজিদে প্রথমে আসবেন, তিনিই সামনের কাতারে বসার সুযোগ পাবেন।

দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন লোকটির বাড়ির বাগানের মালী কম মূল্যের পোষাক পরিধান করে প্রথমে মসজিদে এসে সামনের কাতারে বসেছে। এরপর তার মনিব বহু মূল্যবান পোষাক পরিধান করে মসজিদে এসে তারই বেতনভুক্ত মালীকে একথা বলতে পারবে না যে, তুমি আমার বেতনভুক্ত চাকর, আমি তোমার মনিব। আমার সামনে বসার অধিকার তোমার নেই।

যে মনিবকে দেখলে তার চাকর তটস্থ হয়ে পড়ে, বার বার সালাম জানায়, মনিবের সামনে যেন কোনো ধরনের বেয়াদবি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকে, মনিবের দেহের সাথে যেন নিজের দেহের স্পর্শ না ঘটে এ জন্য শঙ্কিত থাকে।

কোনো কারণে যদি মনিবের পায়ের সাথে নিজের পায়ের স্পর্শ তার অজান্তেই ঘটে যায়, তাহলে চাকরী যাবার ভয়ে চেহারা রক্তশূন্য হয়ে যায়। সেই চাকরই যখন মনিবের আগে মসজিদে এসে সামনের কাতারে বসে যায়, পরে মনিব এসে ঐ চাকরের পেছনে বসে।

এরপর নামাযে সিজ্‌দা দেয়ার সময় চাকরের পা যদি মনিবের মাথায় লেগে যায়, মনিবের এ কথা বলার সাহস নেই যে, নামাযে সিজ্‌দা দেয়ার সময় তোমার পা আমার মাথায় লেগেছে। এ জন্য তোমাকে এই শাস্তি গ্রহণ করতে হবে এবং আজ থেকে তোমাকে চাকরিচ্যুত করা হলো।

একমাত্র নামাযই মানুষের মধ্যে থেকে উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা যাবতীয় ভেদাভেদ মুছে দিয়ে সাম্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নামায মানুষে মানুষে কোনো ধরনের ভেদাভেদ রাখে না। ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন–

একহি স্যফ মে খাড়ে হো গ্যায়ে মাহ্‌মুদ ও আয়ায

না কোই বান্দা রাহা না কোই বান্দা নাওয়ায।

সম্রাট মাহ্‌মুদ আর তাঁর ভৃত্য একই সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, কে সম্রাট আর কে ভৃত্য কোনো ভেদাভেদ থাকেনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েই এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, সারা দুনিয়া তাঁদের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছিলো। নামায থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যে সাম্য আর ঐক্য সৃষ্টি করেছিলো, এই সাম্য আর ঐক্যের কারণেই ইসলামী আদর্শ সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে তওহীদের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Philip K. Hitty তাঁর History of the Arabs নামক গ্রন্থে নামায প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, As a disciplinary measure this congrational prayer must have had great value for the proud indivisualistic sons of the desert. It developed in them the sense of social equality and the consciousness of solidarity. It promoted that brotherhood of community of believers which the religion of Mohammad had theoretically Substituted for blood relationship. The prayer ground thus became the first drill ground of Islam.

অর্থাৎ শৃঙ্খলা অনুশীলনের একটি ব্যবস্থা হিসেবে মরুভূমির উদ্যত ও আত্মকেন্দ্রিক সন্তানদের ক্ষেত্রে জামাআতের নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নামায তাদের মধ্যে সামাজিক সাম্য এবং উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার

চেতনার সৃষ্টি করেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ তাত্ত্বিকভাবে রক্ত সম্পর্কের স্থলে অভিন্ন জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিস্থাপন করেছিলো এই নামায তাকে উৎসাহিত করেছে। নামাযের ময়দান এভাবে ইসলামের প্রথম কুচকাওয়াজের ময়দানে পরিণত হয়েছে।

J. H. Dennisson কর্তৃক রচিত Emotion as the Basis of Civilization নামক গ্রন্থটি বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং তার উপসর্গ বিশ্লেষণে সহায়ক একটি অমূল্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, Mohammad had created a religion which had none of the features of the ancient cults, no priesthood, and no ceremonial, which was based on no form, but upon a spiritual relationship to, an unseen God. It was not designed to give prestige to a special group but to creat a universal brotherhood composed of all men of every race who would accept this God and promise loyalty to his prophet.

The vast difficulty of creating any sense of unity of solidarity in such a group is apparent. All historians declare that the amazing success of Islam in dominating the world lay in the estounding coherence or sense of unity in the group. But they do not explain how this miracle was worked. There can be little doubt that one of the most effective means was prayer. The five daily prayers when all the faithful, wherever they were, alone in the grim solitude of the desert or in vast assemblies in crowded city knelt or prostated themvelves towards Mecca, uttering the same words of adoration for the one true God and of loyalty to His prophet, produce an overwhelming effect even upon the spectators, and the psychological effect of thus fusing the minds of the worshippers in a common adoration and expression of loyalty is certainly stupendous. Mohammad was the first one to see the tremendous power of public prayer as a unification culture and there can be little doubt that the power of Islam is due to a large measure to the obedience of the faithful to this inviolable rule of the five prayers.

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন যার সাথে প্রাচীন ধর্ম পদ্ধতিসমূহের কোনোটিরই সাদৃশ্য ছিলো না। এতে কোনো পুরোহিততন্ত্র নেই, নেই কোনো আনুষ্ঠানিকতা। মূর্তিহীন নিরাকার অদৃশ্য এক স্রষ্টার সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হচ্ছে এই ধর্মের ভিত্তি। একটি বিশেষ শ্রেণীকে প্রতিপত্তি প্রদানের কোনো অভিসন্ধি এর নেই, বরং বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ যারা এই স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের সকলের জন্য সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য।

এ ধরনের লোকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির চেতনা সৃষ্টি করা কত কঠিন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সকল ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারে ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে ছিলো মুসলমানদের আশ্চর্যজনক সংঘবদ্ধতা বা দলীয় শৃঙ্খলা। কিন্তু তাদের কেউ এই মু'যিযা কিভাবে কাজ করেছে, তার ব্যাখ্যা দেননি। এ ব্যাপারে নূন্যতম সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই ঐক্য ও সংহতির পেছনে ফলপ্রসূ যেসব ব্যবস্থা কাজ করেছে তার মধ্যে নামায হচ্ছে অন্যতম।

মরুভূমির ভয়ানক নিঃসঙ্গতার মধ্যে একা অথবা জনবহুল নগরীতে যেখানেই বিশ্বাসী মুসলমানরা অবস্থান করুক না কোনো, যখন তারা একত্রিত হয়ে মক্কার দিকে কেবলা করে জানু পেতে বসে অথবা ভক্তিভরে অবনমিত হয়ে রুকু সিজদায় গিয়ে এক স্রষ্টার আরাধনা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে লিপ্ত হয়, তখন এমনকি দর্শকবৃন্দও অভিভূত হয়ে পড়ে। নামাযী লোকদের বিগলিত মনের এই সম্মিলিত আরাধনা ও আনুগত্যের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিস্ময়কর।

ঐক্যের সংস্কৃতি হিসেবে জামাআতের নামায তথা প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনার শক্তি কত বিশাল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম তা প্রত্যক্ষ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যই হচ্ছে ইসলামের শক্তি অর্জনের জন্য বিরাট অংশ দায়ী।

যে জাতির মধ্যে ঐক্য, স্বকীয়তা, কেন্দ্রমুখিতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই, সেই জাতির পক্ষে সারা পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় তাদের পক্ষে নেতৃত্বের আসন নিয়ন্ত্রণ করা। একমাত্র নামাযই

মুসলমানদের মধ্যে এই একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদেরকে নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তোলে। এ জন্যই জামাআতে নামায আদায় করার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ –

নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (সূরা বাকারা-৪৩)

শুধুমাত্র নামায প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়নি, যেখানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে তথা জামাআতে নামায আদায় করে, সেখানে তাদের সাথে গিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জামাআতে নামায আদায় করার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করে বলেছেন–যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং এর অনুসরণের পথে অর্থাৎ জামাআতে উপস্থিত হবার ব্যাপারে কোনো ওযরই প্রতিবন্ধক হিসেবে না দাঁড়ায় তার ঘরে আদায় করা কোনো নামায কবুল হবে না। প্রকৃত ওযর কি– এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভয় অথবা রোগ। (আবু দাউদ)

যারা জামাআতে উপস্থিত হয় না, তাদের ব্যাপারে নবীজী ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন– আমার ইচ্ছা হয় এই নির্দেশ জারী করতে যে, এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে নামায আদায় শুরু করুক, আর আমি লাকড়ী বহনকারী একদল সাথীসহ ঐসব লোকদের ঘর-বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিই যারা নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয় না। (বোখারী-মুসলিম)

প্রশ্ন ওঠে, যারা জামাআতে নামায আদায় করে না, তাদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কেন। এর কারণ হলো, পৃথিবীতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার সর্বোপরি তাদের টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে জামাআতী জিন্দেগী তথা সাংগঠনিক জীবনের ওপর। আর জামাআতে নামাযই মুসলমানদের একতাবদ্ধ করে, সাংগঠনিক জীবনের প্রশিক্ষণ দেয়, নেতা নির্বাচন, নেতার আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

জামাআতে নামায মুসলমানদের প্রথমে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, তাদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে। সংগঠন ভুক্ত হয়ে তাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। সংগঠন থেকে কোনো মুসলমান বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে না। কোনো মুসলমান বিপদগ্রস্থ হলে গোটা সংগঠন তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ একজন মুসলমান যে কোনো সমস্যায় নিপতিত হলে সে নিজেকে কখনো অসহায় বোধ করবে না। কারণ সে জানে, তার বিপদে সে একা নয়– গোটা সংগঠন তার পাশে এসে দাঁড়াবে। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত কখনোই সম্ভব হয় না। মুসলমানদের প্রধান যে দায়িত্ব অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, এই দায়িত্ব পালন করা কোনো মুসলমানের পক্ষে একা সম্ভব নয়– সাংগঠনিক শক্তি অপরিহার্য। এই অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের জন্যই জামাআতে নামায মুসলমানদের সাংগঠনিক জীবন গঠনের প্রশিক্ষণ দেয়।

عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىْ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ لْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ-

হযরত হারেসুল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামাআতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামাআত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামাআতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে। (মুসনাদে আহ্‌মদ, তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দল নেতার আনুগত্যকে অস্বীকার করে দল পরিত্যাগ করলো এবং সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

মানব সমষ্টির এমন একটি দলকে জামায়াত বলা হয়, যারা একটি বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশেষ কোন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়। দলবদ্ধতার জন্য চারটি জিনিস অপরিহার্য। যেমন- উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, নেতৃত্ব ও সংগঠন। এই চারটির যে কোন একটির অভাবে দল গঠন পূর্ণ হবে না। এ কারণেই হাট-বাজারের সংঘবদ্ধ লোকদেরকে জামায়াত বা দলভুক্ত বলা হয় না। কারণ উপরোক্ত শর্তগুলোর একটিও এর মধ্যে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ঈদগাহ ও জুমুয়ার মসজিদের দলবদ্ধ লোকদেরকে জামায়াত বা দলবদ্ধ বলা হয়। কারণ, উপরোক্ত শর্তসমূহের সবকটিই তার মধ্যে বিদ্যমান।

পৃথিবীর বড় বড় ইমারত বা রাজপথ নির্মিত হয়েছে ইট বা পাথর দিয়ে। এসব ইট বা পাথর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দাবী করা যায় না যে, এসব একটি ইমরাত বা মজবুত পথ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট-পাথরগুলো একটির সাথে আরেকটি সাজানো হলে তবেই তা ইমারত বা পথের আকৃতি ধারণ করবে। যেসব শলাকা একত্রিত করে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়ু প্রস্তুত করা হয়, সেসব শলাকা বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকলে তা আবর্জনা পরিষ্কার করার ক্ষমতা অর্জন না করে- বরং স্বয়ং শলাকাই আবর্জনায় পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সংগঠন বহির্ভূত মুসলমান নিজেই বাতিল শক্তির শিকারে পরিণত হতে বাধ্য। শয়তানের আক্রমণ তথা বাতিলের আবর্জনা মুক্ত থাকার জন্যই প্রত্যেক মুসলমানকে সাংগঠনিক জীবনের আওতায় আসতে হবে।

হাদীসে জামায়াত বা দলকে ইসলামী জামায়াত বা দল অর্থে বুঝানো হয়েছে। আর ইসলামী জামায়াত বা দল বলা হয় এমন একটি দল বা জামায়াতকে যে দলটি আল্লাহ ও রাসূলের তথা কোরআন-হাসীদের প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান

প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কোন একজন নেতার (ইমামের) নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বাতিলকে ধ্বংস করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব মুসলমানদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী দল। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সংযোগহীন একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাতিলকে ধ্বংস করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের জামায়াত বা দলের উপর অর্পণ করেছেন– কোন একক ব্যাক্তির প্রতি নয়। কারণ এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ এক ব্যক্তির চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। তা সে একক ব্যাক্তি যতবড় জ্ঞানী-গুণী বা ক্ষমতাশালী লোক হোক না কেন। নবী-রাসূলের মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও একটি সংগঠিত জামায়াত বা দলের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ জন্যই হাদীসে জামায়াত বা দলের সাথে একত্রিত থাকার জন্য অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং জামায়াত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুর্খতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

عَنْ مُعَاذْ ابْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ–قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ النَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ–(احمد)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মেষ পালের মধ্য থেকে) বাঘ সেই মেষটিকে ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। অথবা (খাদ্যের অন্বেষণে) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা (দল ছেড়ে) দুর্গম গিরি পথে একা যাবে না। এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে।

আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কিছু লোক পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। চারণভূমি এবং পর্বতের পাদদেশে তারা তাদের পশুগুলোকে দলবদ্ধভাবে চরাতো। বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী কোন পশুকে ধরে নিয়ে যেতে না পারে, এ জন্য তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। ফলে রাখালদের অস্ত্রের ও পশুদলকে পাহারা দেয়ার শিকারী কুকুরের ভয়ে কোন বাঘই পশুদলকে আক্রমণ

করার সাহস পেত না। কিন্তু রাখালদের অগোচরে কোন পশু যদি ঘাস খেতে খেতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, তখনই নিকটবর্তী পর্বতের গুহা বা জংগল থেকে বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবার সুযোগ পেত।

এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, দলছাড়া পশু যেমন বাঘের শিকার হয় তেমনি জামায়াত বা দল ছাড়া মুসলমানও শয়তানের শিকার হয়, তা সে যত বড় ঈমানদার মুসলমানই হোক না কেন। সারা বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানদের যে দুর্দশা ও দুর্ভোগ তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমানদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য। মুসলিম দেশগুলোর অনৈক্যের কারণেই গুটি কয়েক ইয়াহূদীর হাতে প্রতি মুহূর্তে মুসলিম নারী, শিশু, যুবক-বৃদ্ধের রক্ত ঝরছে। ঈমানহারা মুসলিম মিল্লাতের কোনো সম্মান-মর্যাদা পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই।

অমুসলিমের মধ্যে কতিপয় রক্ত লোলুপ হায়েনা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে গোটা দুনিয়া ব্যাপী এক নির্মম তান্ডব শুরু করেছে। বর্তমানে যদিও মুসলিম সম্প্রদায় কোথাও দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে দলবদ্ধতা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে নয়; বরং ভাষা বর্ণ অথবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে, যাকে আল্লাহর নবী স্পষ্ট ভাষায় জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَمَنْ شَذَّ شُذَّفِى النَّارِ. (ترمذى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াত বা দলের উপরই আল্লাহ তা'য়ালার রহমত। সুতরাং যে জামায়াত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

এই হাদীসে আল্লাহর হাবীব সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উম্মতেরা কখনও কোন ভুল সিদ্ধান্তের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। আর এরই কারণে ইজমায়ে উম্মতের (সংঘবদ্ধ সিদ্ধান্তকে) শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه. (ابوداؤد)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত বা দল ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দুরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রশি থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিলো। (আবু দাউদ)

ব্যক্তিগত জীবনে একটি লোক যতই আল্লাহভীরু হোক না কেন, যদি সে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত মুসলমানদের কোন জামায়াত বা দলে নিজেকে শামিল না করে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে শামিল হলো না। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যে জামায়াত বা দল গঠিত হয়েছিল তার নাম ছিলো আল জামায়াত।

অর্থাৎ মুসলমানদের একমাত্র জামায়াত বা দল। তখন প্রত্যেকটি লোকের উপর উক্ত জামায়াত বা দলে যোগ দেয়া ফরয ছিলো এবং উক্ত দলের বাইরে থাকা ছিল কুফরী। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের বিদায়ের পর তাঁর উম্মতের মধ্যে একাধিক লোকের নেতৃত্বে একাধিক জামায়াত বা দল হতে পারে। তবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে এক ও অভিন্ন এবং সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থায় আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা।

ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা একাধিক দলও পরস্পর পরস্পরের সাহযোগিতা করবে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর মুসলমানদের বিশেষ কোন একটি জামায়াত বা দল নিজেদের জামায়াত বা দলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য একমাত্র জামায়াত বা দল বলে দাবী করতে পারে না, যার বাইরে থাকা কুফরী। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুসলমানদের কোন একটি দলে অংশগ্রহণ না করে নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একজন সদস্য মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

নেতা নির্বাচনে নামাযের ভূমিকা

অগণিত মানুষ যদি একত্রে জামাআত বদ্ধ হয়ে নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে সেই জামাআতের ইমাম বা নেতা হতে হবে একজন। একের অধিক ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে নামায আদায় করা যাবে না। কেউ যদি তা করে তাহলে তার নামায হবে না। এক কোটি মানুষ যদি কোথাও নামায আদায়ের উদ্যোগ নেয়, তাহলে সেই এক কোটি মানুষই একজন মাত্র নেতার আনুগত্য করবে।

এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, নামায হলো মুসলমানদের জীবনের যাবতীয় কাজের মডেল। এই মডেল সামনে রেখে মুসলমানরা অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবে। জামাআতে নামাযে যাকে ইমাম বা নেতা বানানো হবে, সেই ব্যক্তি নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী কিনা তা যাচাই-বাছাই করে তারপর তাকে ইমাম বা নেতা বানানো হয়।

সাধারণত একটি এলাকা বা মহল্লার মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করার জন্য একজনকে ইমাম নির্বাচন করা হয়। এমন একজন ব্যক্তিকে ইমাম বা নেতা হিসাবে বরণ করা হয়, যিনি এলাকার সকলের তুলনায় কোরআন-হাদীস সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। কোরআন-হাদীস অনুসারে জীবন-যাপন করেন, অর্থাৎ সৎ যোগ্য, আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করেন এমন একজন লোককেই ইমাম বা নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এলাকার সবথেকে বড় চোর, সন্ত্রাসী, চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ বা কুখ্যাতির অধিকারী কোনো লোককে ইমাম বা নেতা হিসেবে বরণ করা হয় না। এমন লোককেও ইমাম বানানো হয় না, যার স্ত্রী-মেয়ে পর্দায় থাকে না বা ছেলে নামায আদায় করে না।

জামাআতে নামায এভাবে প্রশিক্ষণ দেয় যে, নিজ এলাকা, সমাজ বা দেশ— যেখানেই হোক না কেনো, গন্ডী যত ক্ষুদ্রই হোক— সেই গন্ডীতে যাকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হবে, তাকে ঐসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, যে গুণ-বৈশিষ্ট্য মসজিদের ইমাম বা নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিলো।

কোনো স্থানে কিছু লোক জমায়েত হয়েছে এ অবস্থায় নামাযের সময় হলো। ফরজ নামায জামাআতে আদায় করার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেবে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কোন্ ব্যক্তিকে ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করে তাঁর পেছনে নামায আদায় করা হবে। ইসলামের বিধান হলো, ইমাম বা নেতৃত্বের পদের জন্য কেউ প্রার্থী হতে পারবে না, কিন্তু যিনি ইমাম হবেন তাকে উপস্থিত ব্যক্তিদের

আস্থাভাজন হতে হবে। উপস্থিত লোকজন তাকেই ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করবে, যে ব্যক্তি উপস্থিত লোকদের কাছে সৎ-চরিত্রবান ও সর্বাধিক আল্লাহভীরু হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এভাবে প্রতিদিন পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে অসংখ্যবার ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করে জামাআতে নামায আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে না। ইমাম বা নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেউ কারো পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে না, এখানে কোনো লোভ-লালসা বা প্রলোভনের স্থান নেই, কেউ কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে না, কেনো বিরোধী দল বা মতেরও সৃষ্টি হচ্ছে না। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করে তার কমান্ডে অগণিত মানুষ জামাআতে নামায আদায় করছে। সাংগঠনিক জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নামাযের নেতা নির্বাচনের শিক্ষা যদি বাস্তবে অনুসরণ করা হতো, তাহলে বর্তমানে নেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা দল-উপদল, হানাহানি, মারামারি ও হত্যার মতো মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হতো না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, যারা নামায আদায় করছেন, তাদের অধিকাংশই নামাযের এই শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন না।

নামায যে পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন শিক্ষা দেয়, এই পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিপর্যয় বা বিশৃংখলার সৃষ্টি না হওয়ার কারণ তিনটি। প্রথম কারণই হলো নির্বাচনের উদ্দেশ্য। যারা ইমাম বা নেতা নির্বাচন করছেন এবং যিনি ইমাম বা নেতা নির্বাচিত হচ্ছেন, তাদের উভয়ের এ কথা স্পষ্ট জানা রয়েছে যে, এতে কারো কেনো স্বার্থ যেমন উদ্ধার হবে না, তেমনি কারো স্বার্থ ক্ষুণ্ণও হবে না। বরং উভয়ে একমাত্র মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবেন মাত্র। ইমাম বা নেতা যেমন নিজের স্বার্থে তার অনুসারীদেরকে ব্যবহার করতে পারবেন না, তেমনি মুক্তাদী বা অনুসারী দলও ইমাম বা নেতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, জামাআতে নামাযের ক্ষেত্রে ইমাম বা নেতা নির্বাচনকালে কেউ প্রার্থী হতে পারে না বা ইসলাম এই সুযোগ কাউকে দেয়নি। দল বা সংগঠনে নেতা নির্বাচনকালে কেউ প্রার্থী হবে, কেউ নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, কাউকে নেতা নির্বাচিত করার জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে–এসব বিষয় ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি কারো যদি ইশারা-ইঙ্গিতেও নেতা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে সেই পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

নেতা নির্বাচন সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আমার লেখা 'আমি কেন জামাআতে ইসলামী করি' নামক গ্রন্থে। ইসলাম নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থী প্রথার বিলোপ সাধন করেছে। ইসলামী দল বা সংগঠনে কেউ প্রার্থী হতে পারবে না। যেখানে প্রার্থী প্রথা রয়েছে, সেখানেই একের পক্ষে অন্যের প্রচারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, কান কথা, লোভ-লালসা, দল-উপদল, মারামারি, হত্যা তথা যাবতীয় অপকর্মের অস্তিত্ব রয়েছে। জামাআতে নামায নেতা নির্বাচনের যে পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, সেখানে সর্বস্তরে শান্তি বজায় থাকে এবং একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিই নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায় নির্বাচন পদ্ধতিও দুর্নীতি মুক্ত থাকে।

জামাআতে নামাযে নেতা নির্বাচনে মুক্তাদী বা অনুসারী দল তথা সর্বস্তরের ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত ইমাম বা নেতার কাছে যেমন যে কোনো ব্যক্তি অবাধে যাতায়াত করতে পারেন, তেমনি যে কোনো ব্যক্তির কাছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করলে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। এ কারণেই আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দেখতে পাই, তাঁরা নেতৃত্বের পদে আসীন হবার পরে তাঁদের কর্মনীতি, দৈনন্দিন জীবনধারা তথা যাবতীয় কাজের জন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে জবাবদিহি করেছেন। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায এভাবেই মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শোষণমুক্ত, ভীতিহীন, শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নামায থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেই সাহাবায়ে কেরাম বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন।

আজও সে নামায রয়েছে, কিন্তু নবীজী যেভাবে নামায আদায়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, সেই নামায খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই আদায় করে থাকে। যে উদ্দেশ্যে নামায ফরজ করা হয়েছে, সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্মরণে রেখে অতি নগণ্য সংখ্যক মুসলমান নামায আদায় করছে। জামাআতে নামায ঠিকই প্রতিদিন আদায় হচ্ছে, কিন্তু এর যে শিক্ষা তা কোথাও বাস্তবায়ন হতে দেখা যাচ্ছে না।

যে নামায থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমানরা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, সেই নামায কি মুসলমানরা আদায় করছে? বরং বিষয়টি হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। বিশ্ব শাসন করবে মুসলিম জনগোষ্ঠী, এখন লজ্জাজনকভাবে তারাই এমন জাতিসমূহের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, যারা পৃথিবীতে

যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী। মুসলমানরা অসৎ কাজের প্রতি বাধার সৃষ্টি করবে, কিন্তু তারাই অমুসলিম জাতিসমূহ কর্তৃক প্রবর্বিত অন্যায়-অসৎ নীতি-পদ্ধতি প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছে।

জামাআতে নামাযের ইমাম বা নেতা নিজের মর্জি অনুযায়ী নামায আদায় করাতে পারেন না। আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে বলেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবেই ইমাম বা নেতাকে নামায আদায় করাতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায হবে না। ইমাম বা নেতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতির ব্যতিক্রম করছেন কিনা, তা জানার জন্য অনুসারী বা মুক্তাদীদেরকে কোরআন হাদীসের ততটুকু জ্ঞানার্জন করতে হবে, যতটুকু জ্ঞান থাকলে ইমাম বা নেতা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছেন কিনা তা জানা যাবে।

ইমাম বা নেতা যদি ভুল করেন, তাহলে অনুসারী বা মুক্তাদী নেতার ভুল কীভাবে সংশোধন করবেন? ইমাম বা নেতার ভুল সংশোধন করার পদ্ধতিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। এভাবে করে জামাআতে নামায মানুষকে কোরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

নেতা যদি বার বার ভুল করতে থাকেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন-হাদীসের প্রদর্শিত পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহলে সেই ইমাম বা নেতার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে নতুন ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করতে হবে। নেতার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও যেন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। নামাযে ইমাম যদি কোনো ভুল করেন, তাহলে অনুসারী বা মুক্তাদী উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার বলবেন। কোরআনের আয়াত পাঠ করার সময় যদি কোনো শব্দ বা আয়াত বাদ দিয়ে পরবর্তী আয়াত পাঠ করতে থাকেন, তাহলে মুক্তাদী বা অনুসারীদের মধ্যে কারো জানা থাকলে তা পাঠ করে তিনি ইমাম বা নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ইমাম বা নেতার ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জামাআতে নামায নেতা নির্বাচন, নেতার আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ দেয়। ইমাম রুকু সিজদায় গিয়েছেন, মুক্তাদী দাঁড়িয়ে আছে বা ইমাম দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, মুক্তাদী রুকু সিজদায় গিয়েছেন, কোথাও কখনো এমন দৃশ্য পরিলক্ষিত

হবে না। কোনো মুক্তাদী যদি এমন করে তাহলে তার নামাযই হবে না। অর্থাৎ ইমাম বা নেতা যখন যে কমান্ড করছেন, মুক্তাদী বা অনুসারী তৎক্ষণাত তা প্রশ্নাতীতভাবে নীরবে পালন করছে। মুসলমানদের সাংগঠনিক জীবনে ঠিক এভাবেই নেতার আনুগত্য করতে হবে, যেভাবে জামাআতে নামাযে ইমামের আনুগত্য করা হয়। তবে নেতার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্তই করা যাবে, যতক্ষণ নেতা কোরআন-হাদীস ভিত্তিক নির্দেশ প্রদান করবে।

নামায সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামায যেমন মুসলমানদের প্রতি বাধ্যতামূলক করেছেন তথা ফরজ করেছেন, তেমিন সঠিক সময়ে নামায আদায় করাও ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا–

বস্তুত নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবির্তর্তা সহকারে ঈমানদার লোকদের ওপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আন নিসা-১০৩)

সময় মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মানুষের জীবনকাল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, খুবই অল্প সময় মানুষকে দান করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের গড় আয়ু হলো ৬০ বছর। পূর্ববর্তী নবী-রাসূল যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যেমন অধিক হায়াত পেয়েছেন, তেমনি তাঁদের উম্মতগণও অধিক হায়াত পেয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত স্বল্প হায়াতের অধিকারী বিধায় তাদেরকে এমন সুযোগ-সুবিধা মহান আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন যে, এরা অল্প কাজের অধিক বিনিময় পাবে। যেমন মুমিন বান্দা সুবহানাল্লাহ, আল হাম্‌দু লিল্লাহ উচ্চারণ করলে তার আমলনামায় অসংখ্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার রমজান মাসের প্রত্যেক কাজের সর্বাধিক বিনিময় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কদরের রাতের সম্মান-মর্যাদা অগণিত রাতেরও অধিক বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ জন্য সময়ের ব্যাপারে ইসলাম মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সতর্ক করেছে এবং সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার জন্য নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ কাল বা সময় অত্যন্ত তীব্র গতিতে মানব জীবনকে জীবনের শেষ প্রান্তে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। এ জন্য সময় মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে যতটুকু সময়কাল নির্ধারণ করেছেন, তার অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও কারো পক্ষে এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানুষ সময়ের যে হিসাব করে, সেই সময় অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যদি ৮০ বছর তিনদিন তিন ঘন্টা তেত্রিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যাবতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চৌত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে পারবে না। মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সময়কাল থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্ধারিত এই সময়ের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

মানব সন্তান শৈশব অতিক্রম করে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের কোঠা ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে, এর অর্থ হলো বদ্ধ কলি থেকে ফুল যেন প্রস্ফুটিত হলো। আর ফুল প্রস্ফুটিত হবার অর্থই হলো এখন সে যে কোন মুহূর্তে ঝরে যাবে। রোদ, বৃষ্টি-ঝড়ে ফুল ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।

মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার অর্থই হলো সে এখন ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের সোনালী যৌবনের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, মহাকাল সেই সৌরভ ক্রমশ নিঃশেষে চুষে নেয়। যৌবনের সুষমা, লাবণ্য আর মাধুরীময় আভা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যে সময় মানব জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সে সময় প্রাণান্তকর সাধনার পরেও আর ফিরে পাওয়া যায় না।

মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে মহামূল্য সময়। এই সময়ই মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না। নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া বা তার গতি পরিবর্তনও করা যায়, কিন্তু কালের স্রোতের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই।

অর্থের অপব্যবহার করলে তাকে অমিতব্যায়ী বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় অমিতব্যায়ী হলো সময়ের অপব্যবহার যে করে। কারণ সময় হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর মানুষ এই বড় সম্পদই সবচেয়ে বেশী অপচয় করে থাকে।

আজকের এই নবীন ঊষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। জ্ঞানের অভাব হলে তা

অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়।

বর্তমান বলে কিছুই নেই, যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়, অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ–আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, এরই নাম সময়। যে ফুল গভীর নিশীথে ঝরে পড়েছে, তা আর কখনোই ফুটবে না। যে সময় চলে যাচ্ছে মানব জীবনের ওপর দিয়ে, তা আর ফিরে আসবে না।

পৃথিবীতে বর্তমান বলে কিছুই নেই–এই মুহূর্তটি পর মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিটি অনাগত মুহূর্ত এসে ভবিষ্যতকে বর্তমানে রূপান্তরিত করছে এবং বর্তমান মুহূর্ত চোখের পলকে অতিবাহিত হয়ে কালের গর্ভে প্রবেশ করে বর্তমানকে অতীতে রূপান্তরিত করছে। বাড়ির ঘড়িটি সেকেন্ডের স্তর পার হয়ে মিনিট অতিক্রম করে ঘন্টা চিহ্নিত স্থানে গিয়ে শব্দ করে বাড়ির মালিককে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'ওহে গৃহকর্তা! এখনো সাবধান হও, তোমার জন্য নির্দিষ্ট জীবনকাল থেকে একটি ঘন্টা পুনরায় কোনদিন ফিরে না আসার জন্য মহাকালের বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো।' মানুষ তার জীবনকাল সম্পর্কে দীর্ঘ আশা পোষণ করে অথচ ক্ষণ পরে কী ঘটবে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

পৃথিবীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রশ্ন পত্রের ওপরে লেখা থাকে, 'সময়–৩ ঘন্টা।' অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলা হয়েছে, তা তিন ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। শুধু লিখলেই চলবে না, সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষায় যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। নির্দিষ্ট এই সময় অতিক্রান্ত হলে পরীক্ষার্থীকে সময় দেয়া হয় না। পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার স্থানে প্রশ্নের উত্তর না লিখে সময় ক্ষেপণ করে, তাহলে সে কোনভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে পরীক্ষার্থী যত অনুরোধই করুক না কেন, তাকে কিছুতেই সময় দেয়া হয় না।

মানব জীবনের বিষয়টিও ঠিক এমনি। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট সময়কাল দেয়া হয়েছে এবং তাকে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে তার কাজ

হলো সে আঁকা-বাঁকা পথ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ যে পথ তাকে প্রদর্শন করেছেন, সেই পথে সে তার জীবনকাল অতিবাহিত করবে। সময় মানব জীবনের প্রকৃত মূলধন। এই মূলধন তাকে যথার্থ পন্থায় ব্যয় করতে হবে। যে কাজের জন্য বরফ নিয়ে আসা হলো, সেই কাজে বরফ ব্যবহার না করে তা যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে সে বরফ তো অত্যন্ত দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা কোনো কাজেই লাগবে না।

মানুষের জীবনও বরফের মতোই। তাকে যে নির্ধারিত জীবনকাল দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কালের কৃষ্ণকালো বিবরে গিয়ে প্রবেশ করছে। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়কে যদি অপচয় করা হয় বা আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, সে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে স্বয়ং নিজের যে ক্ষতি করছে, সেই ক্ষতি কখনো পুষিয়ে নেয়া যাবে না। এই ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্যই যথাযথ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়েছেন। ফজরের নামায কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সূয উদিত হওয়ার পরে আদায় করে, তাহলে তার নামায হবে না। যোহর বা আসরের নামায যদি কেউ সন্ধ্যার পরে আদায় করে তাহলে তার নামায হবে না। নামায যিনি ফরজ করেছেন, তিনিই নামায আদায়ের সময়ও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ-اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا-

নামায প্রতিষ্ঠিত করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কোরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো। কারণ ফজরের কোরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭৮)

উল্লেখিত আয়াতে যে 'দুলূক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী কালের মুফাস্‌সিরীনে কেরাম এর অর্থ করেছেন, দুপুরে সূর্যের পশ্চিম দিকে হেলে পড়া। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'গাসাকিল লাইলি' শব্দের অর্থ কেউ করেছেন রাতের সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাওয়া। এর অর্থ হলো ইশার নামাযের প্রথম ওয়াক্ত। আবার কেউ অর্থ করেছেন, মধ্যরাত বা গভীর রাত। এর অর্থ হলো ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত। উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত 'ফজর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, প্রভাতের প্রকাশ পাওয়া, প্রভাতের উদয় হওয়া, নিশি ভোর হওয়া বা রাতের

অবসান হওয়া। অর্থাৎ রাতের অবসানের সেই প্রথম সময়টি, যখন পূর্ব গগনে পূর্বাশার ইশারা দেখা দেয় বা প্রভাতের সাদা-শুভ্রতা অন্ধকার রাতের বক্ষ ভেদ করে উঁকি দিতে থাকে।

'দুলূক' শব্দের অর্থ কেউ করেছেন সূর্যের পতন হওয়ার ক্ষেত্রে। প্রকৃত অর্থে সূর্যের পতনও চার বার হয়ে থাকে। প্রথমবার সূর্য যখন দিনের অর্ধেক অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে। দ্বিতীয়বার সূর্য যখন অপরাহ্নের দিকে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল্য ও উত্তাপ হারিয়ে এক বিশেষ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তৃতীয়বার সূর্য যখন পশ্চিম গগনে অস্তমিত হয়ে যায়। চতুর্থবার পশ্চিম দিগন্তের দিকচক্রবালে দৃশ্যমান রক্তিম আভা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই চারটি সময়কে কেন্দ্র করেই ধারাবাহিকভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর ফজরের নামাযে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করার বিষয় উল্লেখ করে ফজরের নামায আদায়ের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে, ফজরের সময়ে কোরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়। এ কথার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর অগণিত ফেরেশ্তা এ সময়ের সাক্ষী হয়। হাদীসে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর ফেরেশ্তারা প্রত্যেক নামায ও সৎকাজের সাক্ষী হন, তবুও বিশেষভাবে ফজরের নামাযে কোরআন পাঠের ব্যাপারে তাঁদের সাক্ষী হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে এর গুরুত্ব ও গভীর তাৎপর্যের দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঠিক এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে দীর্ঘ আয়াত ও সূরা পড়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ফজরের নামাযে পবিত্র কোরআনের যে কোনো দীর্ঘ সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতেন। আবু দাউদও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সফরকালে তিনি ফজরের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস অথবা প্রথম রাকাআতে সূরা নাস ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফালাক তিলাওয়াত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এই নীতিই অবলম্বন করতেন।

মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ করা হয়েছিলো, তার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে যে, দিনের সূচনার নামায আদায় করতে হবে সূর্য উদয়ের পূর্বে। আর পরবর্তী চার ওয়াক্ত নামায সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের প্রথম প্রহরে আদায় করতে হবে। কোন্ সময়ে কোন্ পদ্ধতিতে এই

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিব্রাঈল আমাকে দুই বার আল্লাহর ঘরের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করান। প্রথম দিন যোহরের নামায ঠিক এমন এক সময়ে আদায় করান, যখন সূর্য সবেমাত্র ঢলে পড়েছিলো এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার তুলনায় অধিক দীর্ঘ হয়নি। এরপর আসরের নামায এমন এক সময়ে আদায় করান, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘের সমপরিমাণ ছিলো। মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করান, যখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করে। এরপরে ইশার নামায আদায় করান পশ্চিম আকাশের লালিমা শেষ হয়ে যাবার পরে। আর ফজরের নামায আদায় করান যে সময়ে রোযাদারের প্রতি শেষ রাতে আহার করা হারাম হয়ে যাওয়ার সময়ে।

দ্বিতীয় দিন জিব্রাঈল আমাকে যোহরের নামায এমন সময় আদায় করান যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘের সমান ছিলো। আসরের নামায আদায় করান এমন সময় যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিলো। মাগরিবের নামায আদায় করান এমন সময় যখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করে। ইশার নামায আদায় করান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ফজরের নামায আদায় করান আলো চারদিকে স্পষ্টভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরে। এরপর জিব্রাঈল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ! এটা হচ্ছে নবীদের নামায আদায়ের সময় এবং এই দুটো সময়ের মধ্যেই হচ্ছে নামাযের সঠিক সময়।

হযরহ জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রথম দিন যে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায আদায় করান এবং দ্বিতীয় দিন যে সময়ে নামায আদায় করান, এই সময়ের মধ্যে নামায আদায় করতে হবে। আল্লাহর ফেরেশ্তা প্রথম দিন নামাযের প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করান এবং দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় করান। তিরমিজী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন– নামাযের প্রথম সময়ে নামায আদায় করা হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ। আর শেষ সময়ে নামায আদায় করা হলো, ক্ষমা লাভের সুযোগ।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেনোদিন কেনো ওয়াক্তের

নামায দুইবার শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি। অর্থাৎ বিশেষ কেনো কারণ ব্যতীত আল্লাহর নবীর অভ্যাস ছিলো প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করা। আল্লাহর নবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি? জবাবে তিনি বলেছেন, প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করা। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরা প্রতিদিন আসর ও ফজরের নামাযের সময় পালা বদল করে থাকেন। যদিও মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন, তবুও তিনি ফেরেশ্‌তাদের কাছে জানতে চান, তুমি যখন আমার বান্দার কাছে গিয়েছিলে তখন তাকে কি অবস্থায় পেয়েছিলে এবং যখন তাকে ছেড়ে এসেছো, তখন কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? আসর ও ফজর নামাযের সময় মহান আল্লাহর যেসব বান্দা নামাযরত অবস্থায় থাকে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়, হে আল্লাহ! আমরা তোমার বান্দাকে নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই ছেড়ে এসেছি।

ফেরেশ্‌তাদের মুখে এ কথা শুনে আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হন। সুতরাং নামায আদায় করতে হবে যথাযথ সময়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে−

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ−

নামায আদায় করো দিনের দুই প্রান্তে এবং কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর। (সূরা হূদ-১১৪)

এই আয়াতে ফজর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে। সূরা ত্বাহা-এর ১৩০ আয়াতে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ انَاءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى−

আর নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাতের সময় পুনরায় পবিত্রতা বর্ণনা করো আর দিনের প্রান্তসমূহে।

নিম্নের আয়াতেও ফজর, যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায আদায়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ-وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ-

সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো যখন সন্ধ্যা হয় এবং যখন প্রভাত হয়। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো দিনের শেষ অংশে এবং যখন তোমাদের দুপুর হয়। (সূরা রূম-১৭-১৮)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেসব প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সূর্য পূজারীদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে। প্রত্যেক যুগেই এমনকি বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগেও এক শ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ সূর্যকে মহাশক্তির উৎস মনে করে তার পূজা করে থাকে এবং তারা পূজা করে সূর্য উদয়, সূর্য মধ্য গগনে ও সূর্য অস্তের সময়। এ জন্য এই তিনটি সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম নামায আদায়ের সময় নির্ধারণ করে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও সময়ের মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সময় মানুষের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই সময়কে যারা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম, তাদের পক্ষেই পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। নামায যেমন আদায় করা ফরজ, অনুরূপ ফরজ যথাসময়ে নামায আদায় করা। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সময় সচেতন ও সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নামাযের গুরুত্ব

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার অর্থই হলো, সমাজ, দেশ তথা পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহীতার যে প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এই পথ মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ নয়– এই পথ কন্টকাকীর্ণ। এই কাজ যেমন মর্যাদপূর্ণ তেমনি বিপদসঙ্কুল খেদমতের কাজ। এই পথে অগ্রসর হবার সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিবিধ প্রকার বিপদ-মুসীবত অবতীর্ণ হবে, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ধৈর্য, দৃঢ়তা, তিতীক্ষা, সঙ্কল্প, উচ্চাকাঙ্খা ও অবিচল ভূমিকার মাধ্যমে এসব কঠিন বিপদের মোকাবেলা করে আল্লাহর পথে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হতে হবে আর তখনই তাদের ওপরে মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজ করার জন্য যে শক্তি-সামর্থ প্রয়োজন, তা দুটো জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। প্রথম হলো 'সবর' বা ধৈর্য ও যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে বিকশিত করা। (সবরের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা আসরের তাফসীর দেখুন।)

দ্বিতীয় হলো নামায। নামাযের মাধ্যমে নিজেদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলা। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ–

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য প্রার্থনা করো, আল্লাহ্ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা-১৫৩)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পথে মানুষকে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। আর এসব বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলায় মনকে সুদৃঢ় রাখার একমাত্র মাধ্যম হলো নামায। এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের লোকজন দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে এমন এমন ভিত্তিহীন কথা বলবে, যা শুনলে মন-মানসিকতা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। এই অবস্থা যেনো কোনো

মুমিনের মধ্যে সৃষ্টি না হয়, এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে নবীকে লক্ষ্য করে মুমিনদেরকে বলেছেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজদাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর দাসত্ব করে যেতে থাকো। (সূরা হিজর-৯৭-৯৯)

এই নামাযই যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনকে প্রশান্তিতে ভরে তুলবে। নামায যাবতীয় যন্ত্রণার উপশম, মানুষের ভেতরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। আল্লাহর সৈনিকের সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি করে এবং ঐ যোগ্যতা ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল-অবিচল থাকার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন। একদিকে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাকে গালিগালাজ করছে, তার বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ ছড়াচ্ছে, তার পথে প্রতিরোধের দেয়াল তুলে দিচ্ছে, অন্য দিকে সে এসব কিছুর তোয়াক্কা না করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সম্মুখের দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছে– এই যোগ্যতা নামাযই সৃষ্টি করে দেয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের ওপরে পাহাড়-পর্বত সমান বিপদ-মুসিবত এসেছে, এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে নামাযের প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। কারণ এই নামাযই যাবতীয় বিপদ-মুসিবতকে অগ্রাহ্য করার মতো মনোবল সৃষ্টি করে দেয়।

অভাব যখন ঘিরে ধরেছে, দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হয়েছে, এক বস্ত্রে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে, চোখের সামনে দেখা গিয়েছে ইসলাম বিরোধী শক্তির শান-শওকত আর জাঁকজমক পূর্ণ অবস্থা, সন্তান-সন্ততি ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করেছে, এই অবস্থাতেই একমাত্র নামাজই মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى–

নিজের পরিবার পরিজনকে নামাজ আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই। (সূরা ত্বা-হা-১৩২)

এই আয়াতে পারিবারিক একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্ম নিয়োগ করেছো তারা ঐ লোকগুলোর তুলনায় অস্বচ্ছল– যারা আমার বিধানের বিরোধিতা করছে এবং পৃথিবীতে পাপের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাদের অন্যায় ভোগ-বিলাসিতা দেখে তোমাদের সন্তান-সন্তুতি নিজেদের অভাব-অনটন ও দুরাবস্থার কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে– এ জন্য তাদেরকে নামায আদায়ের আদেশ দাও। তাহলে নামাযই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবে এবং তাদের মূল্যবোধ পরিবর্তিত করে দেবে। তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন হয়ে যাবে। তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রিযিকের ওপর সবর করবে এবং তাতেই পরিতুষ্ট হবে।

ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয় সেই কল্যাণকে তারা এমন ভোগের ওপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেবে, যা অন্যায় ও অসৎ এবং পার্থিব লোভ-লালসার পথে অর্জিত হয়েছে। আর আমার কোনো লাভের জন্যও নামায আদায় করতে বলছি না, বরং এতে তোমাদের নিজেদেরই লাভ নিহিত রয়েছে। সেই লাভ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে আর একমাত্র তাকওয়াই হলো পৃথিবী ও আখিরাতে, উভয় স্থানে স্থায়ী এবং কল্যাণের প্রতীক ও মাধ্যম।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে নিয়মিত জামাআতে নামায আদায় করতে দেখবে, তখন তাকে মুসলমান বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (তিরমিযী)

আমরা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি নামায আদায় করে না– এ কথা কল্পনা করার কোনো অবকাশই ছিলো না। এমনকি জামাআতে নামায আদায় না করলে তাকে মুসলিম সমাজের একজন বলে তাকে কেউ স্বীকৃতিই দিতো না।

মুনাফিক যারা ছিলো, তারাও মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করতে বাধ্য হতো। নামায ছেড়ে দেয়ার কেনো অবকাশ সে সমাজে ছিলো না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ নামায তো আদায় করেই না– বরং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে বিরোধিতার ক্ষেত্রে কুফুরী শক্তির তুলনায় অধিক যোগ্যতার সাথে বিরোধিতা করে, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, তারপরও নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি। এই শ্রেণীর লোকদের পরিচয় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন–

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ–لاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ–

এরা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে, না পূর্ণভাবে এদিকে না পূর্ণভাবে ওদিকে। (সূরা নিসা-১৪৩)

নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করে এমন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মতবাদ-মতাদর্শ অনুসরণ করে এবং তা সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা-সাধনা করে, যে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মতবাদ-মতাদর্শ ইসলামী জীবন বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐসব আদর্শ সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের শেষ চিহ্নটুকু বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এসব কুফুরী মতবাদ-মতাদর্শ অনুসরণ করে ও সমাজ-দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা-সাধনা করেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করে। আর তাদের দাবির অনুকূলে সাড়া দিয়ে একশ্রেণীর আলেম নামধারী লোকজন ফতোয়াও দিয়ে থাকে।

তাদের বিয়ে, মৃত্যুর পরে জানাযা, কুলখানি ও চল্লিশায় নিজেরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীন সমাজের সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ কথাই প্রমাণ করে যে, লোকটি মুসলমান ছিলো। অথচ রাসূলের যুগে মুসলিম হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে হলে তাকে অবশ্যই মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাযের জামাআতে উপস্থিত হতে হতো এবং ইসলাম ও কুফরের সংঘাতের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ইসলামের পক্ষে তৎপরতা প্রদর্শন করতে হতো।

পৃথিবীর প্রতিটি মানবীয় দল বা সংগঠনের যেমন তার কেনো সদস্য বা কর্মীকে দল কর্তৃক আহূত বৈঠকসমূহে কোনো কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত হতে দেখলে নিঃসন্দেহে এটাই ধরে নেয়া হয় যে, দলের অথবা দলের কর্মতৎপরতার প্রতি তার

আগ্রহ-উৎসাহ বর্তমান নেই এবং দল কর্তৃক আহূত ক্রমাগত কয়েকটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করে দেয়। অনুরূপভাবে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় থেকে অনুপস্থিত থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্পষ্ট ধারণা করা হতো যে, ইসলামের প্রতি লোকটির মনে কেনোই আগ্রহ-উৎসাহ আর অবশিষ্ট নেই।

আর যদি কেউ পর পর কয়েকদিন নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকতো তাহলে এ কথা অকাট্যরূপে প্রমাণ হয়ে যেতো যে, ঐ লোকটি আর মুসলিম মিল্লাতে নেই- সে মুসলমান নয়। এ কারণেই সে যুগের পরিচিত ও বিখ্যাত এবং কট্টর মুনাফিকদেরকেও যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য মসজিদে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হতে হতো।

কারণ, জামাআতে নামায আদায় ব্যতীত তারা মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্গত থাকতে পারতো না এবং মুসলিম সমাজ সংগঠনের একজন হিসাবে গণ্য করা হবে না- এ কথা তাদের চেতনায় শাণিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে জামাআতে নামায আদায় করা অথবা বাড়িতে একাকী নামায আদায় করা কোনোটিই নয়- নামায আদায় না করলেও মুসলমান থাকা যাবে। এই চিন্তা ও বিশ্বাস মানুষের ভেতরে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। কারণ নামায আদায় করে না এবং সার্বিক আচার-আচরণ দিয়ে এ কথা প্রমাণও করে যে, সে ইসলামী জীবন বিধান পছন্দ করে না। এসব কিছু করেও উক্ত ব্যক্তি যখন দেখছে, তার যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখনই একশ্রেণীর আলেম তার প্রয়োজনে উৎসাহভরে সাড়া দিচ্ছে- সুতরাং সে নামায আদায় না করে এবং ইসলামী জীবন বিধানের বিপরীত আদর্শ অনুসরণ করেও মুসলমানই আছে। সে যে মুসলমান তার প্রমাণ তো এটাই যে, কোরআন-সুন্নাহ্‌য় অভিজ্ঞ আলেমগণ তার ডাকে সাড়া দেয়, তাকে সহযোগিতা করে।

এভাবে করে পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন একশ্রেণীর মুসলমানদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, নামায আদায় না করে ও ইসলামী জীবন বিধানের সাথে বিরোধিতা করেও মুসলমান থাকা যায়, অনুরূপভাবে তাদের অনুকূলে একশ্রেণীর আলেম নামধারী লোকদের আচরণও পাশ্চাত্যের সৃষ্টি করা ভ্রান্ত ধারণাকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করেছে যে, নামায আদায় না করেও মুসলমান থাকা যায়।

কারণ ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শে বিশ্বাস নামধারী মুসলিম লোকগুলো যখন দেখছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা গালি দিচ্ছে, ইসলামকে বিদ্রুপ করে

কবিতা-সাহিত্য রচনা করছে, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করছে, রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের বিপরীত মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাণপাত করছে, সুযোগ পেলেই হক্কানী আলেম-ওলামাদের ধরে দলে দলে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করছে, তাদের ওপরে নির্যাতন করছে, মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করছে, মাদ্রাসা বন্ধ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে, মুসলিম নারীদেরকে পর্দাহীন হতে বাধ্য করছে।

এত কিছুর পরও ঐ লোক যখন তাদের প্রয়োজনে আলেমদেরকে ডাকছে, তখন একশ্রেণীর আলেম তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে, দলে দলে দাড়ি-টুপিওয়ালাদেরকে তাদের মিছিল-মিটিংয়ে উপস্থিত করাচ্ছে, এসবই তো তাদের মুসলমান থাকার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ। তারা যদি মুসলমান না হতো, তাহলে তাদের ধারে কাছে কেনো আলেম ঘেষতো না, কেনো টুপিওয়ালাকে তাদের মিছিল-মিটিংয়ে দেখা যেতো না। কেনো পীর সাহেবও তাদের তৎপরতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতো না।

অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিজেকে কেনো ব্যক্তি ইসলামের কেনো একটি ক্ষুদ্র বিধানের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করার পরও নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করবে– এ কথা সে সমাজে কল্পনাও করা যেতো না। সে যুগে একজন মুসলমানের সাথে একজন ইয়াহুদীর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ দেখা দিলো। বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি সার্বিক অবস্থা জেনে ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিলেন।

আল্লাহর রাসূলের দেয়া রায়ে মুসলিম ব্যক্তিটি সন্তুষ্ট হতে না পেরে সে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দ্বারস্থ হয়ে জানালো, 'আমি একজন মুসলমান, নামায আদায় করি, জিহাদেও যোগ দেই, রায়টা তো আমার পক্ষে আসা উচিত ছিলো। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুতরাং আপনি বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান করে দিন।' এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রোষকষায়িত লোচনে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তের সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের বিচার হলো এই।' কথা শেষ করেই তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন– এ কথা শোনার পরে চারদিকে একটি গুঞ্জন উঠেছিলো। আল্লাহর রাসূলও বিব্রতবোধ করছিলেন। এমন সময়

আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ওমরের কাজের পক্ষে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। বলা হলো, 'আপনার প্রভুর শপথ! আপনার সিদ্ধান্তের সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে তারা মুমিন নয়।'

সুতরাং হযরত ওমর যে কাজ করেছেন, সঠিক কাজ করেছেন। অথচ বর্তমানে কাফিরদের পক্ষ থেকে নয়– নামধারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বদম্ভে ঘোষণা করা হচ্ছে, 'কোরআন সুন্নাহর আইন-কানুন দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া হবে না।' এ কথা যিনি বলছেন, তিনিও অবলীলাক্রমে নিজেকে মুসলমান হিসাবেই মুসলিম সমাজের একজন ভাবছেন। একশ্রেণীর আলেম নামের লোকজন তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯৬ সনের পরে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো। সে সময় আমিও জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ছিলাম। সংসদে আমি মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিল উত্থাপন করেছিলাম। মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করা যায় কিনা, তা যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাছে মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলো। তারা নানা ধরনের অজুহাত দেখিয়ে মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলের বিপক্ষে মতামত পেশ করলো।

যেদিন কমিটির মিটিং হলো, সেই কমিটিতে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিচালক-যার নামের পূর্বে 'মাওলানা' উপাধি ছিলো– তিনিও উপস্থিত ছিলেন। আমি ধারণা করেছিলাম, সবাই যখন এই মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলের বিরুদ্ধে কথা বলছে, মাওলানা সাহেব অন্তত এই বিলের পক্ষে কথা বলবেন। কিন্তু আমি অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, উক্ত মাওলানা সাহেব আল্লাহর গোলামী করেন না– গোলামী করেন ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের। তিনি মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন, শুধু তাই নয়– বাংলাদেশের সংবিধানে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার কথা বলা হয়েছে' উক্ত মাওলানা সাহেব সংবিধানে উল্লেখিত এই কথাটি বাদ দেয়ার পক্ষেও জোরালো কণ্ঠে বক্তব্য রাখলেন।

আল্লাহর বিধানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেও এসব লোকজন নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করে এবং তাদের দাবির অনুকূলে বর্তমান মুসলিম সমাজের একশ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে সাড়াও পায়। অথচ সে যুগে আল্লাহর বিধানের

বিপক্ষে কোনো শব্দ উচ্চারণ করার দূরে থাক– মুনাফিকরা মসজিদে এসে জামাআতে নামায আদায় করতে বাধ্য হতো। ঈমানদারদের নামাযে উপস্থিত হওয়া আর মুনাফিকদের নামাযে আসার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। ঈমানদাররা বিশেষ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে মসজিদে উপস্থিত হতো বা সময়ের পূর্বেই মসজিদে আসতো। নামায আদায় শেষ করেও তারা মসজিদে অবস্থান করতো। অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এ কথা প্রমাণ হতো যে, তাঁরা নামাযের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহশীল।

কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা ছিলো ঈমানদারদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আযান শোনা মাত্র তাদের শরীরে যেনো এলার্জি সৃষ্টি হতো। তাদের চেহারা ও আচরণে এক মহাবিরক্তি যেনো ঝরে পড়তো। একান্ত অনিচ্ছাভরে তারা মসজিদে উপস্থিত হতো, পা দুটো যেনো মসজিদের দিকে আসতে চায় না, এমন উৎসাহহীন ভঙ্গিতে হেঁটে আসতো। নামাযের জামাআত শেষ হবার সাথে সাথে তারা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠ লোকের মতো ছিট্‌কে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতো। এভাবে মুনাফিকদের প্রত্যেকটি আচার-আচরণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হতো যে, আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম– নামাযের ব্যাপারে তারা মোটেও আগ্রহী নয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর গোলামী করতে ইচ্ছুক নয়। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا–

এরা যখন নামাযের জন্য চলতে শুরু করে তখন শুধু লোক দেখানোর জন্য চোখ-মুখ কাচুমাচু করে চলতে থাকে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা-১৪২)

সে যুগের মুনাফিকদের আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে অঙ্কন করেছেন–

وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ–

তারা নামাযের জন্য আসে বটে, কিন্তু আসে একান্ত অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়। আর আল্লাহর পথে তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে বটে; কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছা সহকারে। (সূরা তওবা-৫৪)

পক্ষান্তরে বর্তমান কালের মুসলিম নামধারী বেনামাযীদের লোকদের আচরণ সে যুগের মুনাফিকদের তুলনায় অধিক বিস্ময়কর। সে যুগে আযান শোনার সাথে সাথে মুনাফিকদের গোটা অবয়বে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতো এবং তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মসজিদে উপস্থিত হতো। বর্তমান কালের একশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে আযান শোনার পরে কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তারা বিরক্তিও প্রকাশ করে না অথবা নামাযেও উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাদের কোনো চেতনাই নেই।

একটি পশু অথবা কাফির ব্যক্তি আযান শোনার পরে পূর্বে যে কাজ করছিলো তাই যেমন করতে থাকে, এ যুগের ঐ লোকগুলোও তাই করতে থাকে– যারা নামায আদায় না করেও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। কাফির ব্যক্তির কানে আযান প্রবেশ করার পরে তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না এটাই স্বাভাবিক। সে যে কাজে ব্যস্ত ছিলো সেই কাজেই মগ্ন থাকবে। একটি পশু যা করছিলো, আযান শোনার পরেও তাই করতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেকে যে ব্যক্তি মুসলমান বলে দাবি করে, আযান শোনার পরে তার মধ্যে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির সাথে কাফির আর পশুর কি পার্থক্য রইলো?

নামাযই হলো মুসলমানদের প্রাণশক্তি, মুসলমানদের সকল কাজে এই নামাযই তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে অন্য কারো নয়– একমাত্র মহান আল্লাহর গোলাম এবং সেই আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রত্যেকটি গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করছেন, সে যার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি নামায আদায়ের মাধ্যমেই এ কথার প্রমাণ পেশ করে যে, সে নিজে যেমন আল্লাহ তা'য়ালার গোলামী করতে আগ্রহী অনুরূপভাবে অন্য সকলেও যেনো শয়তানের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে আল্লাহর গোলামী করার মাধ্যমে মুক্তি ও সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়, এ কারণেই সে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করছে।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাযের। বান্দাহ্ যদি সন্তোষজনকভাবে নামাযের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে অন্যান্য আমলেও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর সে যদি নামাযের হিসাব সন্তোষজনকভাবে দিতে না পারে তাহলে তার অন্যান্য আমলও খারাপ হবে। (তাবরাণী)

ইমাম তিরমিযী কিতাবুল ঈমানে সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন– হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে থেকে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হলো নামায।

যদি এই হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌছে যাবে। আর যদি এই হিসাবটিতে গলদ দেখা যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরজগুলোর মধ্যে কিছুটা কম দেখা যায় তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখো আমার বান্দার কিছু নফলও আছে নাকি। তার সাহায্যে তার ফরজগুলোর কমতি পূরণ করে নাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই করা হবে। (তিরমিযী)

নামায আদায় না করার অর্থই হলো, সেই ব্যক্তি তার আপন মনিব আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করছে। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করার অর্থই হলো স্পষ্ট শির্ক করা এবং শির্কারীর জন্য জান্নাত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শির্ককে ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আখিরাতের ময়দানে যার আমলনামায় সামান্যতম শির্ক দেখা যাবে, তার আমলনামা ঘৃণাভরে ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে।

এ জন্যই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে– হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষের এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা। (বোখারী-মুসলিম)

হাদীসে নামায ত্যাগ করাকে কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম নামায ব্যতীত তাঁদের আমলের মধ্যে থেকে অন্য কিছু ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। আখিরাতের ময়দানে জাহান্নামীদেরকে যখন প্রশ্ন করা হবে–

فِىْ جَنّٰتٍ-يَتَسَاءَلُوْنَ-عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ-مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ-قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ-

কোন্ জিনিসটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গিয়েছে? তারা বলবে, আমরা নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। (সূরা মুদাস্‌সির-৪২-৪৩)

উল্লেখিত আয়াতের স্পষ্ট অর্থ হলো, যেসব লোক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর নাজিল করা কিতাবের যাবতীয় বিধান মেনে নিয়েছে, তাদের প্রধান

কর্তব্যই হলো নামায আদায় করা। এ জন্যই জাহান্নামীরা বলবে যে, আমরা নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। অর্থাৎ আল্লাহর গোলামী করবো, এ কথার স্বীকৃতিই হলো নামায আদায় করা। সুতরাং আমরা নামায আদায় করিনি তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনায় ইচ্ছুক ছিলাম না।

এখানে এ কথা স্পষ্ট মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈমান গ্রহণ না করে কোনো ব্যক্তিই যথারীতি নামায আদায় করতে পারে না। নামায আদায় করার জন্য প্রথম ও পূর্ব শর্ত হলো ঈমান। এ কারণে নামায আদায়কারীদের মধ্যে শামিল হওয়ার অনিবার্য পরিণতি ঈমানদারদের দলে শামিল হওয়া তথা এক সমাজ-সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকা, সমাজ ও দেশের বুকে নামাযের শিক্ষা তথা আল্লাহর বিধান ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা।

নেতৃত্বের গুণাবলী ও নামায

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম মিল্লাতের প্রতি নামায আদায় ফরজ করেছেন এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তারা যেন পৃথিবীর মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। এখানে একটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন করতে হলে ক্ষমতা ও শক্তি অবশ্যই প্রয়োজন। শক্তিশালী কোনো ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র দুর্বল কোনো ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের আদেশ অবশ্যই পালন করবে না। দুর্বল যখন শক্তিমান-ক্ষমতাধরের সামনে কোনো কথা বলে, তখন তা কাকুতি-মিনতি বা অনুরোধের পর্যায়ে পড়ে। আর পৃথিবীতে অনুরোধ, উপদেশ বা কাকুতি-মিনতি করে অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখা যায়নি।

সারা পৃথিবীর প্রায় ছয়শত কোটি মানুষ ইরাক আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ক্ষমতাশালী আমেরিকার প্রতি অনুরোধ জানালো, প্রতিবাদ করলো কিন্তু আমেরিকাকে বিরত করা গেল না। যিনি আদেশ করবেন, আদেশ না মানলে আদেশদাতার যদি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে আদেশ কখনো পালিত হবে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা নামায আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে সেই শক্তি অর্জন করার ব্যবস্থা করেছেন, যে শক্তি অর্জন করলে তাদের দেয়া আদেশ পালিত হবে। মুসলমানদেরকে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হবে। কিভাবে তা সম্ভব, এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারাই কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা-সহকারে আগমন করেছিলেন এবং যা গ্রহণ করে তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই জীবন ব্যবস্থার প্রতি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাবে। 'ঈমান এনেছি, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করছি, তসবীহ্ পাঠ করছি, কোরআন তিলাওয়াত করছি তথা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছি' এইটুকুর মধ্যেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

যে মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করা হচ্ছে, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আল্লাহর দেয়া যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তা নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে সেই মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। যে সত্য গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে সেই সত্যের সাক্ষী হিসাবে গোটা পৃথিবীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে 'মধ্যমপন্থী দল' হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী দল বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

বিশ্ব-ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্র আবির্ভাবের কারণই হলো এটা যে, তারা পৃথিবীর মানুষকে মহাসত্যের দিকে দিকে আহ্বান জানাবে। এই আয়াতে 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো, 'মধ্যপন্থী উম্মত'। কোরআনে ব্যবহৃত 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দটির অর্থ এতটাই ব্যাপক অর্থবোধক যে, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার মাধ্যমে এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য এবং ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই উম্মতে ওয়াসাতা শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁদের অনুরূপ সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো মানব গোষ্ঠী ইতোপূর্বে তৈরী হয়েছিল, না কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় তৈরী হবে। অর্থাৎ এমন একটি মানব গোষ্ঠী, যারা সর্বোন্নত যাবতীয় গুণ বিভূষিত। সুবিচার, সততা, ন্যায়-নীতি এবং যাবতীয় বিষয়ে যারা মধ্যমপন্থা অনুসরণে অভ্যস্থ। তাঁরাই ছিলেন গোটা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক, উন্নতি-অগ্রগতির পরিচালক ও অগ্রনায়ক, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির পথনির্দেশনা দানকারী। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার যাদের জীবন-অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিলো।

অন্যায় বা জুলুমমূলক সম্পর্ক তাদের কারো সাথে ছিল না বরং সেস্থান দল করেছিল ন্যায় ও ইনসাফ। গোটা জগতের সামনে যারা ছিল সর্বব্যাপক ও সার্বিক দিক দিয়ে কল্যাণ, শুভ ও সুন্দরের প্রতীক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা দ্বীনে হক অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাঁরা এবং সেভাবেই তাঁরা সত্যের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ভেতরে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানবমন্ডলীকেই 'উম্মতে ওয়াসাতা' হিসাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছিলো এ কারণে যে, তাঁরা যথাযথভাবে বুঝে নামায আদায় করতেন।

মুসলিম মিল্লাত মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে তথা যাবতীয় অন্যায়-অসৎ কাজের মূলোৎপাটন করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ইমরাণের ১০৪ নং আয়াতে বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মন্ডিত হবে।

অর্থাৎ মানবমন্ডলীর ভেতরে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করার কাজ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ অনুরোধ ও উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালোকাজে রত করানো যায়নি। অথবা ভালো কাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো মাওলানা বা পীর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে, আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন।

পৃথিবীর মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না পারলে এই দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া–নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের

পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎপরতা চালাতে হবে। মহাসত্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে বেছে বের করে নেয়া হয়েছে—অর্থাৎ এই কাজের জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

পৃথিবীতে সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো। (সূরা ইমরান-১১০)

নবী করীম (সাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতি

কোরআন-সুন্নাহ্য় মানুষের জন্য যেসব আদেশ নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করার পদ্ধতিও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর বান্দাদের শিখিয়েছেন। কোরআন-সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধ কিভাবে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তবায়িত করতে হবে, এ ব্যাপারে একমাত্র আদর্শ নমুনা বা মডেল হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রোজা পালন, যাকাত আদায় বা নামায আদায়ের নিয়মাবলী কি— তা অনুসন্ধান করতে হবে আল্লাহর রাসূলের জীবনে।

মহান আল্লাহর গোলামী করা বা তাক্বওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্য অর্জন করতে চায়, তাঁর নির্দেশ পালন করে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যে পদ্ধতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অনুসরণ করেছেন এবং একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর গোলামী করা তথা তাঁর সন্তুষ্টি বা সান্নিধ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে কেউ যদি নিজের মনগড়া পদ্ধতি অনুসরণ করে বা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়, তাহলে তা অবশ্যই পালন করা যাবে না। সুতরাং নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে, যে পদ্ধতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন—

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ-

তোমরা ঠিক সেভাবেই নামায আদায় করো, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছো। (বোখারী-মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করেছেন আল্লাহর দেয়া নিয়ম নীতি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে যে পদ্ধতিতে নামায আদায়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তিনিও সেই একই পদ্ধতিতে নামায আদায়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحى اِلَىَّ-

আমি কারো কোন আদর্শই অনুসরণ করি না, আমি তাই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনেও তাঁর নবীর শিখানো পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

وَمَااتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ-وَمَانَهكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও ধারণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

একমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতি অনুসরণ করলেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বা তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করা সম্ভব। ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষ অবশ্যই পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ تُطِعُوْهُ تَهْتَدُوْا-

তোমরা রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেই সত্য সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। (সূরা নূর-৫৪)

সুতরাং সেই পদ্ধতিতে নামায আদায় করলে মানুষের চরিত্র সংশোধন হবে এবং মানুষ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে– যে পদ্ধতিতে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। কালের প্রবাহে শুধুমাত্র নামায আদায়ের ক্ষেত্রেই নয়– মুসলিম হিসেবে দাবীদার লোকজন ইবাদাতের নামে এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকে, যা আল্লাহর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ-তাবেতাবেঈ এবং সালফে সালেহীনের জীবনেও খুঁজে পাওয়া যায়

না। অজ্ঞতার কারণে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকজন বর্তমানে ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। নামায হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার সেই ইবাদাত-যা পালন করে বান্দা পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে। অতএব এই অতিব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যথাযথ নিয়মে এবং সঠিক সময়ে অবশ্যই পালন করতে হবে। ইতোপূর্বে আমরা নামায আদায়ের সঠিক সময় সম্পর্কে কোরআন-হাদীস থেকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে নামায আদায়ের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে হাদীস থেকে উল্লেখ করছি।

হযরত উক্ববা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনটি সময় এমন যে, এই সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায আদায় ও মৃত লোকদের সমাহিত করতে নিষেধ করেছেন। সে সময় হলো, সূর্য উদিত হয়ে ওপরে না পৌছা পর্যন্ত, দ্বি-প্রহরে সূর্য হেলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে পূর্ণ অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম-আবু দাউদ)

হাদীস গ্রন্থে এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি সময় ছাড়াও ফজরের নামাযের ফরজ নামাযের পরে অর্থাৎ সূর্যের পূর্ণ আলো বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের ফরজ নামাযের পরে অন্য কোনো নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-আসরের নামাযের পরে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো নামায নেই এবং ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত না পর্যন্ত কোনো নামায নেই। (বোখারী-মুসলিম)

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ফরজ নামায আদায়ের পূর্বে ও পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত যে কয় রাকাআ'ত নামায আদায় করেছেন, তা ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় সুন্নাত নামায হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-যে ব্যক্তি দিন ও রাতের মধ্যে মোট ১২ রাকাআ'ত নামায আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হবে। তাহলো, যোহরের নামাযের পূর্বে চার রাকাআ'ত এবং পরে দুই রাকাআ'ত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাআ'ত, ইশার নামাযের পরে দুই রাকাআ'ত আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাআ'ত। (তিরমিযী, নাসায়ী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাআ'ত নামায আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন- এই দুই রাকাআ'ত নামায

পৃথিবী ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি ফজরের (ফরজ) নামাযের পূর্বে দুই রাকাআ'ত সুন্নাত নামায আদায় করতে পারেনি, সে যেনো সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করে নেয়। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যোহরের ফরজ নামায আদায়ের পূর্বে চার রাকাআ'ত সুন্নাত নামায আদায় করতে না পারলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাযের পরে তা আদায় করতেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে নফল নামায আদায় করেছেন এবং সবশেষে বিতিরের নামায আদায় করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা রাতে বিতিরের নামাযকে তোমাদের শেষ নামায করো। (বোখারী)

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগতে পারবে না বলে মনে করে, সে যেনো রাতের প্রথম ভাগেই (ইশার নামাযের পরেই) বিতির আদায় করে নেয় এবং ঘুমায়। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের শেষ অংশে (তাহাজ্জুদ) নামায আদায়ের আশা করে সে যেনো শেষ রাতে বিতির আদায় করে। কারণ শেষ রাতের ক্বিরাআত (শ্রবণ করার জন্য ফেরেশ্তাদের) উপস্থিতির সময় এ জন্য তা অধিক উত্তম। (ইবনে মাজাহ্)

শুধুমাত্র ফরজ ও সুন্নাত নামাযই নয়- নিয়মিত নফল নামাযও আদায় করা উচিত। এতে করে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কিয়ামতের দিন বান্দার কর্মসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। বান্দা যদি নিয়মিত যথাযথভাবে নামায আদায় করে থাকে তাহলে সে মুক্তি লাভ করবে এবং সফলকাম হবে। আর যদি নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু পাওয়া যায়, তাহলে সে ব্যক্তি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি ফরজ নামাযের মধ্যে কোনো ভুল-ক্রটি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ করবেন, দেখো- আমার বান্দার ফরজ ব্যতীতও কোনো অতিরিক্ত নামায রয়েছে কিনা। থাকলে তা দিয়ে ফরজ নামাযের ভুল-ক্রটি দূর করা হবে। সুতরাং সমস্ত কাজের বিচার পর্যায়ক্রমে এভাবেই করা হবে। (তিরমিযী)

নফল নামায সাধারণত বাড়িতেই আদায় করা উচিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা মসজিদে যখন নামায আদায় করবে তখন ঘরের জন্যও নামাযের কিছু অংশ রেখে দিবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'য়ালা নামাযের মাধ্যমে তার ঘরের কল্যাণ সাধন করে থাকেন। তোমাদের নামাযের কিছু অংশ ঘরেও আদায় করবে। (মুসলিম)

নামায আদায়ের পূর্বে নামায আদায়কারীর প্রতি ৭টি বিষয় ফরজ। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হলে নামায সহীহ্ হবে না। প্রথমটি হলো নামাযের সঠিক সময় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। এ ব্যাপারেও আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়টি হলো, শরীর পবিত্র হতে হবে। তৃতীয়টি হলো, পোশাক পবিত্র হতে হবে। চতুর্থটি হলো, নামায আদায়ের স্থান পবিত্র হতে হবে। পঞ্চমটি হলো, শরীরের ঐসব স্থান আবৃত রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যা নারী-পুরুষের জন্য আবৃত রাখা ফরজ করেছেন। অপবিত্র শরীর, পোশাক ও স্থানে নামায আদায় করলে নামায হবে না। ষষ্ঠটি হলো, ক্বিবলা মুখী হতে হবে। এ ব্যাপারেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সপ্তম বিষয় হলো, নিয়্যত করতে হবে। নিয়্যত আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো, অভিপ্রায় বা ইচ্ছা। এই অভিপ্রায় বা ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে মানুষের মনের সাথে সম্পৃক্ত। মুখে উচ্চারণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বা সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে বা তাবেঈ-তাবেতাবেঈ অথবা পরবর্তী সালফে সালেহীনের জীবনীতেও দেখা যায় না যে, তাঁরা নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করেছেন। বর্তমানে নামায শিক্ষা নামক বই-কিতাবে যেভাবে আরবী নিয়্যত বর্ণিত হয়েছে, এসব বাক্যাবলী সাহাবায়ে কেরাম বা তাঁদের পরবর্তী যুগের সালফে সালেহীন মুখে উচ্চারণ করেননি। নিয়্যতের নামে এসব বাক্যাবলী অনেক পরে একশ্রেণীর মানুষ নামায আদায়ের পদ্ধতির সাথে সংযোজন করেছেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর নামায আদায়ের পদ্ধতি

যে বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী আইয়ামে মুজতাহিদীন ও সাল্‌ফে সালেহীন করেননি, তা মুসলমানদের করা উচিত নয়। নিয়্যতের ব্যাপারে নামায আদায়কারীর কর্তব্য হলো, যে ওয়াক্তের নামায আদায় করা হবে এবং ফরজ, সুন্নাত, ওয়াজিব ও নফল নামায যে কয় রাকাআ'ত আদায় করা হবে, মনে মনে তার নিয়্যত বা ইচ্ছা পোষণ করেই নামায আদায়ের জন্য তাকবীরে তাহ্‌রীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়াবে। এই নিয়্যত হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

তাকবীরে তাহ্‌রীমা অর্থাৎ মুখে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে নামায শুরু করা ফরজ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন বলতেন, আল্লাহু আকবার। (বায্‌যার)

কোনো ধরনের অসুবিধা না থাকলে নামায দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। হযরত ইমরাণ ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি অর্শ রোগের রোগী ছিলাম, এ কারণে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায আদায় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন– দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। এতে যদি সক্ষম না হও তাহলে বসে বসে নামায আদায় করবে। এতেও সক্ষম না হলে শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে। (বোখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কেউ বসে নামায আদায় করলে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার অর্ধেক সওয়াব লাভ করবে। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাকবীরের সময়, কখনও তাকবীরের পরে অথবা তাকবীরের পূর্বে হাত উঠাতেন। (বোখারী-আবু দাউদ)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠানোর সময় হাতের আঙ্গুলসমূহ একটির থেকে আরেকটির সামান্য ব্যবধান রাখতেন এবং লম্বা করে হাত উঠাতেন। তিনি দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন। আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। (বোখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে হাত উঠানোর পরে বাম হাতের পিঠ ও কব্জির ওপর ডান হাত রাখা অথবা ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি আঁকড়ে ধরতে হবে। এভাবে

হাত বুকের ওপর অথবা নাভি বরাবর রাখতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় স্থানেই হাত রেখে নামায আদায় করেছেন। এরপর সিজ্‌দার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং ছানা পাঠ করতে হবে। ছানা পাঠ করার বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এরপর আ'উযু বিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম এবং বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম পাঠ করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে। সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধির স্থিরভাবে প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন। তিনি এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতকে মিলিয়ে বিরতিহীনভাবে পাঠ করতেন না। সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না, নামাযের প্রত্যেক রাকাআ'তেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। এই সূরা পাঠ শেষে আমীন বলতে হবে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ আমীন বললে আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও আমীন বলে থাকেন। দুইজন লোকের একজনের আমীন অন্যজনের আমীনের সাথে মিলিত হলে যে আমীন বলবে তার পূর্ববর্তী (ছোট) গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বোখারী-মুসলিম)

এরপর পবিত্র কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পাঠ করতে হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– আমাদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠ এবং কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ)

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে পবিত্র কোরআনের অন্য যে কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব। প্রত্যেক রাকাআ'তেই সূরা ফাতিহা পাঠ করে আমীন উচ্চারণ করে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম বলে অন্য সূরা বা কোরআনের অন্য কোনো আয়াত পাঠ করতে হবে। তবে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাআ'তেই সূরা ফাতিহা পাঠ ও আমীন উচ্চারণ করে অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করতে হবে। যোহর ও আসরের ফরজ চার রাকাআ'তের শেষের দুই রাকাআ'ত, মাগরিবের ফরজ তিন রাকাআ'তের শেষের এক রাকাআ'ত ও ইশার ফরজ চার রাকাআ'তের শেষের দুই রাকাআ'তে শুধু মাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে আমীন উচ্চারণ শেষ করে রুকু সিজ্‌দায় যেতে হবে।

রুকু সিজ্‌দায় কিভাবে যেতে হবে, রুকুর তাসবীহ্, সিজ্‌দার তাসবীহ্, প্রথম সিজ্‌দার পরে সোজা হয়ে বসে কোন্ কোন্ দোয়া পাঠ করতে হবে, তা ইতোপূর্বে

আমরা উল্লেখ করেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে প্রত্যেক বার উঠা, নিচু হওয়া, দাঁড়ানো ও বসার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। (আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– আমি দেখেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহ্রীমার সময় তাঁর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়েছেন এবং রুকুর তাকবীর বলার সময়ও এমন করতেন। রুকু থেকে সোজা হওয়ার সময়ও এমন করতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলতেন। কিন্তু সিজ্দার সময় তিনি হাত উঠাতেন না। (বোখারী)

আল্লাহর রাসূল রুকু সিজ্দায় হাতের আঙ্গুল পৃথক রাখতেন এবং আর সিজ্দার সময় একত্রে মিলিয়ে রাখতেন। রুকু থেকে সোজা হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলেননি, সেই সাথে অন্যান্য দোয়াও পাঠ করেছেন। তিনি রুকু সিজদায় দুই হাতের তালু হাঁটুর ওপর রাখতেন এবং তাঁর পবিত্র বাহুদ্বয় বগল থেকে পৃথক রাখতেন। (ইবনে মাজাহ্)

রুকু সিজ্দাহ্ ধীর স্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে কিভাবে আদায় করতে হবে, এ বর্ণনাও আমরা হাদীস থেকে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক ব্যক্তিকে নামায আদায় করতে দেখলেন। লোকটি রুকু-সিজ্দাহ্ যথাযথভাবে আদায় করছিলো না। তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার নামায আদায় করা হয়নি। এভাবে নামায আদায় করে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাহলে তোমার মৃত্যু হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা যে প্রকৃতি ও স্বভাবে ওপর সৃষ্টি করেছেন সেই স্বভাব ও প্রকৃতির বিপরীত পরিবেশে। (বোখারী)

রুকুর তাসবীহ্ যথা নিয়মে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে পাঠ করে সোজা হওয়ার সময় হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ পাঠ করতে হবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজ্দায় যেতে হবে। সিজ্দায় যাওয়ার সময় মন-মানসিকতা কেমন থাকবে, সিজ্দার পদ্ধতি ও সিজ্দায় কোন্ তাস্বীহ পাঠ করতে হবে, তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দুই হাঁটু নামাযের স্থানে রেখে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে কিবলামুখী করে হাতের তালু দুই

কানের পাশে রাখতেন। কপাল ও নাক সিজ্‌দার স্থানে দুই হাতের মাঝখানে রাখতেন। দুই পায়ের আঙ্গুলের মাথা বাঁকিয়ে কিবলামুখী করে দুই পায়ের গোড়ালী মিলিয়ে পায়ের পাতা সোজা রাখতেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

তিনি যখন সিজ্‌দা করতেন তখন কপাল ও নাক যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন। এ সময় তাঁর পবিত্র বাহুদ্বয় দেহের থেকে এতটা পৃথক রাখতেন যে, বাহুর শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো। তিনি সিজ্‌দায় কখনো হাতের তালু ঘাড় বরাবর কখনো কান বরাবর রেখেছেন। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– বান্দা যখন সিজ্‌দা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজ্‌দা করে। তার মুখমন্ডল, তার দুই হাতের তালু, তার হাঁটু ও তার দুই পা। (বোখারী)

সিজ্‌দার সময় হাতের কনুইসহ হাতের কব্জি পর্যন্ত লম্বা করে বিছিয়ে না দিয়ে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত উঁচুতে রাখতে হবে এবং দুই বাহু পেটের দুই পাশ থেকে দূরে রাখতে হবে। আর দুই হাতের তালুর ওপর দেহের ভার রেখে দুই বাহুকে পৃথক রাখতে হবে। রুকু ও সিজ্‌দায় পিঠ সোজা রাখতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন সিজ্‌দা করবে তখন হাতের তালু দুটো যমীনে স্থাপন করবে এবং দুই কনুই ওপরে উঠিয়ে রাখবে। (বোখারী, আবু দাউদ)

প্রথম সিজ্‌দা আদায় করে ধীর-স্থির ও প্রশান্তির সাথে আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে বসে হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ পাঠ করে পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজ্‌দায় যেতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সিজ্‌দাহ্ দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময়। কারণ সিজ্‌দার মাধ্যমে বান্দা মহান আল্লাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ তা'য়ালা সিজ্‌দার দোয়া বেশী বেশী কবুল করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দায় দুই ধরনের দোয়া বেশী বেশী করতেন। সে দোয়া হলো, মহান আল্লাহর প্রশংসামূলক দোয়া ও প্রার্থনামূলক দোয়া। হাদীসে বর্ণিত এসব দোয়া আমার লেখা 'রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত' নামক বইতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুলনামূলকভাবে ফরজ নামাযে রুকু, সিজ্‌দাহ্ ও সূরা-ক্বিরাআ'ত ছোট করতেন। কিন্তু তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল নামাযে দীর্ঘ করতেন। এসব নামাযে তিনি বড় বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন। রুকু, সিজ্‌দায় বেশী বেশী দোয়া করতেন। প্রথম সিজ্‌দা থেকে উঠে তিনি বাম পা পেতে তার ওপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে কেবলামুখী রাখতেন। এ

সময় তিনি দুই হাত পবিত্র উরুর ওপর রাখতেন। হাতের কনুই উরুর ওপর এবং কব্জি থেকে হাতের তালু পর্যন্ত হাঁটুর ওপর রাখতেন। দোয়া পাঠ শেষে আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজ্‌দা দিতেন।

দ্বিতীয় সিজ্‌দার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের দ্বিতীয় রাকাআ'তের জন্য সরাসরি উঠে দাঁড়িয়েছেন না কিছুক্ষণ বসে তারপর উঠে দাঁড়িয়েছেন, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি কিছুক্ষণ বসে তারপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। অপর দিকে বিপুল সংখ্যক সাহাবী আল্লাহর রাসূলের নামাযের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে নামাযের প্রথম রাকাআ'তের দ্বিতীয় সিজ্‌দার পরে কিছুক্ষণ বসার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয় রাকাআ'তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আউযু বিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, নামাযের গোটা কিরাআতকে যদি একটি কিরাআতের সমষ্টি ধরা হয় তাহলে প্রথম রাকাআতে যে আউযু বিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পড়া হয়েছে, এটাই যথেষ্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় বা পরবর্তী রাকাআ'তসমূহে এসব আর পড়তে হবে না। কেউ বলেছেন, যদি প্রত্যেক রাকাআতের কিরাআতকে স্বতন্ত্র কিরাআত ধরা হয়, তাহলে প্রত্যেক রাকাআতেই সূরা ফাতিহার পূর্বে আউযু বিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পড়তে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রথম রাকাআত সাধারণত দীর্ঘ করতেন এবং পরবর্তী রাকাআতসমূহ প্রথম রাকাআতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করতেন।

অর্থাৎ প্রথম রাকাআতে বড় বড় সূরা বা আয়াত পাঠ করতেন। দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে তিনি বসতেন। এ সময় বাম হাতের তালু হাঁটুর ওপর বিছিয়ে দিতেন এবং ডান হাতের তালু মুষ্টিবদ্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার ওপর রেখে গোলাকার বৃত্তের মতো বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি ওপরের দিকে উঠিয়ে দোয়া পড়তেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করতেন। এ সময়ে তিনি ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। এই বৈঠকেও তিনি বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার ওপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলো বাঁকা করে কিবলামুখী রাখতেন। তিনি নামাযে সব সময় এভাবেই বসতেন কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বা চার রাকাআত নামাযে দুই রাকাআত আদায় করে বসতেন এবং তাশাহুদ পাঠ করতেন। তিনি প্রথম তাশাহুদ

সংক্ষিপ্ত করতেন। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কোরআনের মতোই তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন। (বোখারী-আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআত নামায আদায় করে বসে তাশাহুদ পাঠ করতেন। হাদীসের কিতাবসমূহে বেশ কয়েকটি তাশাহুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হলো–

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ-اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ-السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

অর্থাৎ– সকল মর্যাদাব্যঞ্জক ও সম্মানজনক সম্বোধন মহান আল্লাহর জন্যে। সমস্ত শান্তি, কল্যাণ ও প্রাচুর্যের মালিক আল্লাহ তা'য়ালা। সর্বপ্রকার পবিত্রতার মালিকও তিনি। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল।

চার বা তিন রাকাআত নামাযে তিনি দুই রাকাআত আদায় করে তাশাহুদ পাঠ করে আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়ানোর সময় পায়ের পাতার বুক এবং হাঁটু যমীনে ঠেকিয়ে দুই উরুতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। কেউ বলেছেন, এ সময় তিনি দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন আবার কেউ বলেছেন, তিনি হাত না উঠিয়েই সরাসরি নাভি বা বুকের ওপর রাখতেন। এরপর তিনি অবশিষ্ট ফরজ দুই রাকাআত বা এক রাকাআত নামায শুধু মাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করেই রুকু-সিজদায় যেতেন।

কিন্তু যোহরের চার রাকাআত সুন্নাত নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরা পড়তে হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমও করতেন। যেমন ফজর নামাযে দীর্ঘ সূরা বা আয়াত পড়া ছিলো তাঁর সাধারণ রীতি। কিন্তু কখনো কখনো তিনি ছোট সূরাও পড়েছেন। তাঁর সাধারণ রীতি ছিলো, সকল নামাযেই প্রথম অংশ শেষের অংশের তুলনায় দীর্ঘ করতেন। তিনি সবথেকে দীর্ঘ করতেন রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে।

নামাযের শেষ বৈঠকে তিনি কিভাবে বসতেন, এ সম্পর্কে হাদীসের কিতাবসমূহে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ বলেছেন, তিনি দেহের পেছনের মধ্যাংশ যমীনের ওপর রেখে বসতেন এবং দুই পা ডান দিকে বের করে দিতেন। কেউ বলেছেন, যখন শেষ রাকাআতে বসতেন, তখন বাম পা একটু সম্মুখে এগিয়ে নিতেন এবং ডান পা সোজা রেখে দেহের পেছনের মধ্যাংশের ওপর ভর করে বসতেন। কেউ বলেছেন, শেষ বৈঠকে তিনি তাঁর বাম পা উরু ও ডান জঙ্ঘার মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে দিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বৈঠকে বসার ধরন সম্পর্কে ইমাম আহ্‌মাদ (রাহঃ) বলেছেন, তিনি প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যেই এমন করতেন। প্রথম বৈঠকের পর পুনরায় এক রাকাআত বা দুই রাকাতের জন্যে উঠে দাঁড়াতে হবে, এ কারণে তিনি পায়ের পাতার ওপর বসে দাঁড়ানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। আর শেষ বৈঠকের পরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি থাকেনা বিধায় তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে পরিপূর্ণ দেহ স্থির করে বসতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে, সে যেনো আল্লাহর প্রশংসো ও মহত্ব বর্ণনা করে এবং তাঁর নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করে। এরপর যেনো সে ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দোয়া করে। (আবু দাউদ)

তিনি একজন সাহাবীকে নামাযে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা এবং নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করতে শুনে বললেন– দোয়া করো কবুল হবে এবং চাও দেয়া হবে। (নাসায়ী)

শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও দরুদ পাঠ করার পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধরনের দোয়া করতেন। এসব দোয়া হাদীসের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন দরুদ শিক্ষা দিয়েছেন। এর মধ্যে দুইটি দরুদ উল্লেখ করছি–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ–كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ–إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ–إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করো। তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ করো, যেমনটি করেছিলে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুসি সপ্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের বরকত দান করো, যেমন বরকত দান করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের। নিশ্চয়ই তুমি সপ্রশংসিত মহাসম্মানিত।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ-كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ-وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ- كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ-

অর্থাৎ– হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানগণের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি। আর তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর স্ত্রীগণের এবং সন্তানগণের প্রতি বরকত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীমের বংশধরগণের প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় সম্মানীয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তাশাহুদ ও দরুদ পাঠ করার পরে এই দোয়া পাঠ করতে শিখিয়েছিলেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا-وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের প্রতি অনেক যুলুম করেছি, তুমি ব্যতীত আর কেউ তা ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে ক্ষমা দান করো এবং আমার প্রতি রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

এই দোয়াও তিনি স্বয়ং পাঠ করেছেন এবং অন্যদের শিখিয়েছেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ-وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ-

অর্থাৎ– হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে এবং দোযখের আযাব হতে, জীবন মৃত্যের ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে। (বোখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ–وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ–وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ–اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ–

অর্থাৎ–হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় চাই জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণভার হতে। (বোখারী, মুসলিম)

দোয়া পাঠ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ বলে প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। এ সময় তাঁর ডান গালের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো। এরপর তিনি বাম দিকে সালাম ফিরাতেন এবং এসময়ও তাঁর বাম গালের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

চোখ খোলা রেখে নামায আদায় করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিলো। তবে এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের বক্তব্য হলো, নামাযে চোখ খোলা রেখে যদি খুশূ-খুযু এবং মনোযোগ ঠিক রাখা যায়, তাহলে চোখ খোলা রাখাই উত্তম। আর যদি চোখ খোলা রাখলে নানা ধরনের দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে এবং নামাযে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে চোখ বন্ধ রাখা দোষণীয় নয়। বরং শরীয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী এই অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখাই উত্তম ও পছন্দনীয়।

নামায শেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দোয়া নিজে পাঠ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে পাঠ করার কথা বলেছেন। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ–أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ–أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ–اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ–وَمِنْكَ السَّلَامُ –تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ–

আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার) হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি শান্তিময় আর তোমার কাছে থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময় তুমি। (মুসলিম)

لَاإِلٰهَ إِلاَّ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ –لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ–اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَا لِمَا أَعْطَيْتَ –وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ– وَلَايَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি যা প্রদান করো তা বাধা দেয়ার কেউ-ই নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেয়ার মতো কেউ-ই নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশীল বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। (বোখারী, মুসলিম)

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ -وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ -لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ- وَلاَنَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ -لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ -لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোনো পাপকাজ ও রোগ, শোক বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই আর সৎ কাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত। আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমরা একমাত্র তারই দাসত্ব করি, নেয়ামত সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের কাছে তা অপ্রীতিকর। (মুসলিম)

سُبْحَانَ اللّٰهِ -وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ -وَاللّٰهُ أَكْبَرُ-

আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ।

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ -وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (মুসলিম)

হাদীসে দেখা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে সাত স্থানে দোয়া করতেন। তাকীরে তাহ্‌রীমার পরে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে হাত

বাঁধার পরে, রুকু সিজ্‌দায়, রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে, সিজ্‌দায়, দুই সিজ্‌দার মাঝখানে অর্থাৎ এক সিজ্‌দা দিয়ে বসে, তাশাহ্‌হুদ-দরুদ পাঠ করে সালাম ফিরানোর পূর্বে ও বিতিরের নামাযে সূরা-কিরাআত শেষে। তিনি সিজ্‌দায় গিয়েই সবথেকে বেশী দোয়া করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন কোথায় কোন্ দোয়া করেছেন এবং দিন ও রাতে কোন্ কোন্ দোয়া পাঠ করতেন তা আমার লেখা 'রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদিদের দিকে ফিরে অথবা কিবলার দিকে ফিরে সম্মিলিতভাবে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া বা মোনাজাত করার যে প্রথা বর্তমানে দেখা যায় তার কোনো প্রমাণ হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। অনেকে শুধু মাত্র ফজর ও আসর নামাযের পর মুক্তাদিদের দিকে ফিরে মোনাজাত করে থাকেন। কিন্তু এই পদ্ধতির পক্ষেও হাদীসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসতেন।

নামায সংক্রান্ত হাদীসে যতগুলো দোয়ার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তা সবই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যেই করেছেন এবং নামাযের মধ্যে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন। বান্দা যে সময় পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকে, সে সময় তো প্রকৃতপক্ষে তার রব-এর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা এবং চাইতে থাকে। এ সময় তো বান্দা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয় এবং নামাযরত অবস্থায়ই দোয়া করার উপযুক্ত সময়। এ সময় দোয়া কবুলের সময় এবং এটাই সর্বোত্তম পন্থা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যেই দোয়া করেছেন। দোয়া করার রীতির ক্ষেত্রেও একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে এবং নিজেরা কোনো রীতি আবিষ্কার করা যাবে না।

তবে যে কোনো সময়ই মানুষ মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে বা চাইতে পারে। দোয়া করার পূর্বে পবিত্র অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে মহান আল্লাহর প্রশংসা, দরুদ ইত্যাদি পাঠ করে দোয়া করতে হবে। এভাবে দোয়া করা হলে সেটা পৃথক একটি ইবাদাতের পরে দোয়া করা হলো। নামাযের সাথে আর এর সম্পর্ক রইলো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে নামায থেকে কল্যাণ, বরকত লাভ করার ও নামাযের শিক্ষা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তওফীক এনায়েত করুন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতি অনুসারে নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

চরিত্র গঠনে
নামাযের অবদান
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী